ভূমিকা

ভগবান আছেন কি ?

অসীম সজোরে বলিল—"নাই, ভগবান মানুষের মনগড়া !"

হরিচরণ বলিল—"তিনি আছেন।"

শেষে হরিচরণই বলিল, "তোমার কথাই ঠিক অসীমদা, ভগবান নাই।"

অসীম তেমনি জোরে বলিল, "আছেন তিনি অবশ্যই।

কেন ?—হেতু, লতিকার মুখের কথা।

এ গল্প এই পরিণতির ইতিহাস—বিচার করিবেন পাঠক।

এ বইখানি প্রকাশিত ও নিঃশেষিত হইয়াছিল ত্রিশ বৎসর আগে। তারপর ইহার অপমৃত্যু ঘটিল—সে এক দীর্ঘ ইতিহাস।

এখন এই নূতন সংস্করণ বাহির করিলাম

—গ্রন্থকার

সর্ব্বহারা

Partha Sarathi Bhattacharjee
Ramnagar Road No-5
P.O - Ramnagar.
Agartala, Tripura.

সর্ব্বহারা

১

গোয়াড়ির প্রায় গায়-গায় ঘুর্ণী—সেখানে খ'ড়ে নদীর ধারে পালেদের বাড়ী। তারা হাঁড়ি গড়ে, খেলনা গড়ে, ঠাকুর গড়ে।

হরিচরণের ঠাকুরদাদা ছিল একজন নামজাদা লোক; তার মত মূর্ত্তি গড়িতে কেউ জানিত না। সারা বাঙ্গালা জুড়িয়া তার খরিদ্দার ছিল। বিস্তর পয়সা খরচ করিয়া তাকে বাঙ্গালার সব জেলার বড়লোক লইয়া যাইতেন মূর্ত্তি গড়িতে। গদাই পালের হাতের মূর্ত্তি ছিল নামজাদা।

গদাই পাল দু'খানা পাকা ঘর করিয়াছিল, টাকাকড়িও করিয়াছিল মন্দ নয়। কিন্তু এখন তার অবশিষ্ট আছে শুধু সেই জীর্ণ বাড়ী। তবু তাদের ঘরে এখন তিনখানা চাক চলে; পুতুলের ব্যবসায়ে এখনও তারা বেশ দু'পয়সা রোজগার করে।

হরিচরণের যখন জন্ম হইয়াছিল, তখন গদাইয়ের সম্পদের কতকটা অবশিষ্ট ছিল। তাই তাকে স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিয়াছিল—তার বাপের মনে ছিল হরিকে সে একটা ডেপুটী কি উকীল করিবে।

স্কুলে ভাল ছেলে বলিয়া হরিচরণের নাম ছিল। তাই তার ভাইদের অবস্থা ফিরিয়া গেলেও হরিচরণকে তারা স্কুল ছাড়ায় নাই।

স্কুলের থার্ড ক্লাসে হঠাৎ হরিচরণের ভারি খ্যাতি রটিয়া গেল। সেবার স্কুলের সরস্বতী-পূজার ঠাকুর সে নিজ-হাতে গড়িয়াছিল। শিক্ষক ছাত্র সবাই অবাক্ হইয়া দেখিল—তার কৃতিত্ব অসামান্য।

ইহার পর হইতে তার কাণে সবাই মন্ত্র জপিতে লাগিল, কলিকাতায় গিয়া ভাস্কর্য্য ও চিত্রকলা শিক্ষা করিলে সে একটা বড় লোক হইতে পারিবে। হরিচরণও ক্রমে সেই স্বপ্ন দেখিতে লাগিল।

গোয়াড়ির একটি মেয়ে, নয় দশ বছর বয়স হইবে, বেশ সুন্দর—তার

সঙ্গে ইতিমধ্যে হরিচরণের বিবাহ হইয়া গেল। বউয়ের নাম বিশ্বেশ্বরী—ডাক নাম বিশে।

ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিয়া হরিচরণ বায়না ধরিল, সে কলিকাতায় গিয়া আর্ট শিখিবে।

তার বড় ভাই চৈতন ভাবিয়াই পাইল না যে, পুতুল গড়িবে, পট আঁকিবে, তার জন্য কলিকাতায় যাওয়ার কি প্রয়োজন। রাজ্যের লোক কৃষ্ণনগরে আসে পুতুল কিনিতে, আর কৃষ্ণনগরের গদাই পালের নাতি যাইবে কলিকাতায় পুতুল গড়া শিখিতে—এ কথায় তার আত্মমর্য্যাদায় ঘা পড়িল।

মেজ ভাই ভুবন বলিল, "ও কি একটা কথা হ'ল? পুতুলই যদি শেষে গড়বি, তো এতদিন টাকাগুলো গুণে দিয়ে লেখাপড়া শিখতে গেলি কেন? ও সব কিছু নয়, তুই বি-এ পাশ কর—যাতে বাপ-পিতামো'র মুখ উঁচু হয়।"

হরিচরণ কিছুতে শুনিল না।

তার পর ঝগড়াঝাঁটি রাগারাগি হইল। চৈতন বলিল, "আমি টাকা দিব না, যা কেমন যাবি!"

হরিচরণও রাগিয়া বলিল, "আমি বাড়ী বেচে যাব—এ বাড়ীতে আমারও তো ভাগ আছে বটে।"

ভুবন বলিল, "ঈস্, বড় মরদ—বেচ গা না, কার কত মুরোদ দেখি। গদাই পালের বাড়ী কিনবে এত বড় বুকের পাটাখানা কার একবার দেখে নি। আসে যেন কিনে এ দুয়োরে—দেইখে নিব।"

হরিচরণের বয়স তখন আঠার বছর হইয়াছিল কি না তাহা ঠিক বলা যায় না। তবু একজন তার কাছে জলের দরে তার বাড়ীর অংশ কবালা করিয়া লইল। যা কিছু পাইল তাই লইয়া হরিচরণ কলিকাতায় আসিল।

শপথ করিয়া আসিল আর বাড়ী ফিরিবে না।

তার বউকে চৈতন পাল রাগ করিয়া বাপের বাড়ী পাঠাইয়া দিল। বেচারী যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। তখন বিশের বয়স বারো বছর।

ইহাই হরিচরণের কলিকাতা আগমনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

বাড়ী-ঘর বেচিয়া ছবি আঁকা শিখিতে আসা কাজটাকে বুদ্ধিমানের

কাজ বলিয়া কোনও বুদ্ধিমান স্বীকার করিবেন না। কাজেই হরিচরণকে বুদ্ধিমান বলিয়া স্বীকার করা যায় না। কিন্তু শুধু এই ঝোঁকটা বাদ দিলে হরিচরণের মোটের উপর বিষয়-বুদ্ধি বেশ ভালই ছিল। কত ধানে কত চাল হয়, সে তার জানা ছিল। তার জমা পুঁজি যা সে সেভিং ব্যাঙ্কের বইয়ে জমা রাখিয়াছিল, তাহা দিয়া যে যথেষ্ট পয়সা খরচ করিয়া রীতিমত ভাবে শিক্ষালাভ করা তার পক্ষে সম্ভব হইবে না, তা সে জানিত। তাই সে আর্ট-স্কুলের আসে পাশে দুই চার দিন ঘুরিয়া তার আশা পরিত্যাগ করিল। সে খুঁজিতে লাগিল কোনও আর্টিষ্ট তাকে সাগ্‌রেদ করিয়া কাজ শিখাইতে রাজী হন কি না। সুতরাং কলিকাতায় আসিয়া প্রথম কয়েক মাস তার কাটিল বড় বড় আর্টিষ্টদের কাছে ঘোরা-ফেরায় ;—বিশেষ সুবিধা হইবার মত দেখা গেল না।

একদিন সন্ধ্যাবেলায় হতাশ হইয়া হরিচরণ বিছানায় পড়িয়া ভাবিতে লাগিল। সে বড় জাঁক করিয়া বাড়ী হইতে চলিয়া আসিয়াছে আর্টিষ্ট হইয়া মানুষ হইবে বলিয়া। তার সে বড় আশা পূর্ণ করিবার পথের প্রথম ধাপেই এত বাধা—কে জানে সে সফল হইতে পারিবে কি না? নিষ্ফলতার বোঝা মাথায় করিয়া সে কি ফিরিয়া যাইবে তার ভাইদের কাছে করুণার ভিখারী হইয়া? যদি ফিরিয়া যায় সে, তখন চৈতন ও ভুবন তাকে গালি দিয়া ভূত ঝাড়িয়া দিবে, বউঠাকরুণেরা হয় তো ঝাড়ু লইয়া তাড়া করিবে! নয় তো তারা খুব অনুগ্রহ করিয়া তাকে আশ্রয় দিবে, আর দিন রাত তাকে আর বিশে'কে শুনাইবে যে, তারা দয়া করিয়া তাদের আশ্রয় দিয়াছে।

"কখনই না" বলিয়া শেষে সে মাথা ঝাড়া দিয়া উঠিয়া বসিল। জীবনের যুদ্ধে পরাজয় সে মানিবে না। না হয় মরিবে।

"কি হে ভায়া, রাক্কুসে বেলায় শুয়ে' প'ড়েছ, ব্যাপারখানা কি?" বলিয়া অসীম তার ঘরে ঢুকিয়া তার তক্তপোষের উপর আসিয়া বসিল।

অসীম কলেজে বি-এ পড়ে। খুব মেধাবী ছাত্র সে, কিন্তু কলেজের বই পড়ার চেয়ে রাজ্যের অদরকারী বই পড়াই তার বাতিক। আর এক বাতিক লেখা।

তার অবস্থা বিশেষ ভাল নয় বলিয়া হরিচরণ জানে। বাড়ীতে কিছু সামান্য আয়ের সম্পত্তি আছে, তাহা হইতে তার এক দূর সম্পর্কের

জ্যেঠতুত ভাই তাকে কিছু খরচ পাঠান। কিন্তু অসীমের চালচলন মোটেই গরীবের মত নয়। যে দিন সে টাকা পায় সেই দিন মেসের টাকা দিয়া যা বাকী থাকে তা' সে দুই হাতে খরচ করে। এক সপ্তাহ পরে তার জলখাবার খাইবার সঙ্গতি থাকে না। সে তখন ঘরে বন্ধ হইয়া থাকে; ক্ষিদে পাইলে বিছানায় পড়িয়া প্রাণপণ করিয়া লিখিতে থাকে।

দু' একখানা মাসিক-পত্র মাঝে মাঝে অনুগ্রহ করিয়া তার লেখা ছাপে।

কিন্তু অসীমের মত আনন্দে ভরা যুবক, এমন প্রাণখোলা হাসিভরা রসিক, জগতে দেখা যায় না।

যেদিন হরিচরণ প্রথম মেসে আসিল, সেই দিনই অসীম তাকে আত্মীয় করিয়া লইয়াছিল। হরিচরণের পক্ষে অত সহজে তাকে পরিপূর্ণরূপে আত্মীয় করা সহজ হয় নাই, কিন্তু অসীমের বন্ধুত্বের জোয়ারের মুখে তাকে ক্রমে ভাসিয়া যাইতে হইয়াছিল।

অসীমের প্রশ্ন শুনিয়া হরিচরণ একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "এমন কিছু নয় অসীমদা'।"

"এমন কিছু নয়, কিন্তু মনটা বিষম ভার—কেমন? যেমন সদাসর্ব্বদাই হ'য়ে থাকে পৃথিবীতে।"

হরিচরণকে শেষে সব কথা খুলিয়া বলিতে হইল।

হাসিয়া অসীম বলিল, "ওঃ এই—এর জন্য এত চিন্তা। তুমি যদি আমার মত হ'তে।"

"তোমার মত! তোমার পায়ের ধুলোর মত হ'লে বর্ত্তে যেতাম দাদা। তোমার দুঃখ কি? আজ বাদে কাল বি-এ পাশ ক'রলে তোমার বড় চাকরী হ'বে—"

"যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা! অসীমচন্দ্র ক'রবে চাকরী। জান, Aristotle ব'লেছেন জগতের লোক দুই শ্রেণীর, জাত প্রভু ও জাত দাস, master and slave; চাকরী ক'রবে তারা যারা জন্মদাস। আমার ভিতর কোনওখানে কি জন্মদাসের ছাপ দেখেছো কোনও দিন?"

"চাকরীর মধ্যে তো বড় ছোট আছে—"

"আছে—কিন্তু সবাই slave—servant class। চাকরী মানে কি?

মাথার ঘাম পায়ে ফেলে লেখাপড়া শিখে, যত সব ফ'করে নফরার দোরে দোরে মাথা ঠুকে মরা, শেষে বরাত যদি খুললো, তাদের হুকুম-বরদারী করা--উঠতে ব'সতে তাদের ধমক খাওয়া—সে কাজ আমার নয় ভাই।"

"না হয় চাকরী নাই ক'রলে—ওকালতি ক'রলে তোমায় পায় কে? মুখের যা জোর!"

"কিন্তু মুখের এ জোর কি এমন সস্তা জিনিস যে রাস্তার মুটে-মজুরের কাছে তাকে বেচতে হবে। ভগবানের এত বড় একটা দান কি বিলিয়ে দেব রামা-শ্যামার দায়ে হাকিমের কাছে হুজুর হুজুর ক'রে? 'এহ বাহ্য এহ বাহ্য, আগে কহ আর'।"

"চুলোয় যাকগে, কিছু না হ'ক, তুমি একটা কিছু ক'রে খেতে পাবেই। নিদেন বি-এ পাশ তো হবে। আর আমি—

"তুমি চুলোর পাঁশ—কিন্তু তারও তো কাজ আছে।"

"হাঁ—ও-সব নীতিশাস্ত্রের বুকনি শোনা আছে। থাকবে না কেন দরকার? নিমতলা ঘাটের মুদ্দোফরাসদের চাকরী বজায় রাখবার হয়তো একটু সহায়তা হবে আমাকে দিয়ে।"

"ঈস্, একদৌড়ে নিমতালায় গিয়ে পৌঁছেছো এই আঠার উনিশ বছর বয়সে! তোমার অবস্থা ভাল বোধ হ'চ্ছে না ভায়া; তোমাকে একটু দাওয়াই দিতে হ'চ্ছে। শোন—যদি সুখী হ'তে চাও, দুনিয়াটাকে অত seriously নিও না। জীবন, এ একটা প্রকাণ্ড joke। এতে কাঁদবার কি আছে? না হয় তামাসাটা তোমার উপর দিয়েই হ'চ্ছে—তাতে কি? কাঁদতে হ'বে—

"ছিঁচ্ কাঁদুনে নাকে ঘা!"—

"তামাশা বটে! বুঝতে যদি আমার মত তোমার অবস্থা হ'ত দাদা।"

"কেন ভায়া, তোমার অবস্থাটা মন্দ কিসে? শুনেছি কয়েক শ' টাকা সেভিংস ব্যাঙ্কে আছে—আর আমার?—এই দুনিয়া আমার সেভিংস ব্যাঙ্ক—

"আমার ভাণ্ডার আছে ভ'রে'

তোমা সবাকার ঘরে ঘরে'—

বস্ ঐ পর্য্যন্ত!"

"কিন্তু তোমার বিষয় আশয় আছে।"—

"আছে নয়, ছিল। সে পাপ চুকে গেছে। কাল চিঠি পেয়েছি—নিলাম-খরিদ্দার বিষয়-সম্পত্তি, মায় ভদ্রাসন, দখল করেছে। তাতেও তার দেনা শোধ হয় নি ব'লে, যে দু'খানা ভাঙ্গা বাসন বাড়ীতে ছিল, তাও ক্রোক ক'রে নিয়ে গেছে। এখন নিশ্চিন্ত হওয়া গেছে।"

হরিচরণ অবাক্ হইয়া অসীমের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। সর্ব্বস্বহারা হইয়া তার এ আনন্দ হরিচরণের কল্পনার অতীত।

অসীম বলিল, "বাঁচা গেছে। এতদিন ঐ বিষয়টুকু ছিল আমার গলার বোঝা। যত দিন ছিল তত দিন একটু না ভেবে পারি নি। এমন দুর্দ্ধর্ষ আশাও ছিল যে, ঐ ছাই পাঁশ পাওনাদারের হাত থেকে হয় তো উদ্ধার ক'রতে পারবো। এখন গেছে, আর চিন্তা নেই—একেবারে পুরোপুরি লক্ষ্মীছাড়া হ'য়ে ভাগ্যদেবীর সঙ্গে নিশ্চিন্ত মনে সংগ্রাম ঘোষণা করছি।"

বিস্ময়-বিহ্বল হরিচরণ জিজ্ঞাসা করিল, "তা' হ'লে তোমার এখন চ'লবে কিসে?"

"হয় তো চলবে, নয় তো চলবে না। সে কি আমার হাত? ওরে ভাই, এই পাপটা মন থেকে দূর কর যে, তোমার কি হ'বে না হবে সেটা তোমার হাত। মানুষ দিনরাত তাই ভাবে—তাই ভাবনার তার অন্ত নেই।

বানের মুখে কাঠ
বাছাই ক'রে ভেবে মরে
এঘাট ওঘাট—
কোথায় একটু আরাম ক'রে
হ'তে পারবে কাত
যেন তারই হাত।
বানের জল ছোটে,
ফেলে এঘাট ওঘাট,
তেপান্তর মাঠে
বানের মুখের কাঠ
তখন বড়ই চটে।

কী হাসির কাণ্ড ভেবে দেখ! এই মানুষ! তার কতটুকুই বা শক্তি, কি-ই বা

সে ক'রতে পারে। আধ-ঘণ্টা বাদে কি হ'বে তার উপর তার হাত নেই। সেদিন আমার সামনে একটা লোক একটা ইলিস মাছ কিনে ঘরে ফির-ছিল—হয় তো মনে ভাবছিল, ক'খানা মাছ ভাজা হ'বে—কে ক'খানা খাবে। এলো একখানা মোটর লরি হুস ক'রে—ব্যস্, সব ঠাণ্ডা। এই তো তোমার ভাবনা-চিন্তার দাম। ঝাড়ু মারো ভাবনার কপালে।"

হরিচরণের মাথার ভিতর কথাগুলি টগ্‌বগ্ করিয়া ফুটিতে লাগিল। তার মনের বর্ত্তমান অবস্থায় এই সার সত্যটা খুব সহজে মনে বসিয়া গেল।

অসীম বলিয়া গেল, "অথচ ভেবে দেখ, আমাদের স্পর্দ্ধার অন্ত নেই। আমার প্রপিতামহ ছিলেন প্রকাণ্ড ধনী। তিনি নিজে বড়লোক হ'য়েই খুসী হ'তে পারলেন না—প্রতিজ্ঞা ক'রলেন, আমাদেরও বংশানুক্রমে বড়-লোক ক'রে রেখে যাবেন। মস্ত বড় জমীদারী কিনলেন, প্রকাণ্ড ঘর বাড়ী ক'রলেন; আর একখানা উইল ক'রে সম্পত্তি এমন ক'রে বেঁধে দিলেন, যাতে আমরা হাজার চেষ্টা ক'রে গরীব না হ'তে পারি। তিনি যেই চোখ বুজলেন—লেগে গেল মামলা। মামলা মিটে ঠাকুর্দ্দা যখন ঘরে ঢুকবেন, পদ্মার জলে বাড়ী গেল ভেসে,—আর জমীদারী কতক ডুবে গেল, কতক বিক্রী হ'য়ে গেল। ব্যস্, ঠাণ্ডা। তবু মানুষ হ'তে চায় ভবিষ্যতের বিধাতা।"

হরিচরণ একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল—তার মনে হইল যে, তারও এত বড় আশার প্রাসাদখানা বুঝি এমনি করিয়া ভাঙ্গিয়া যাইবে দুর্ভাগ্যের জোয়ারে। আকাশব্যাপী আশা তার, সীমাশূন্য তার স্পর্দ্ধা—ইহার পরিণতি হইবে কি শেষে একটা অজানা-অচেনা দীন-ভিখারীর দেহের ভস্মস্তূপে?

তার মনটা খুব ভার হইয়া গেল। এক মুহূর্ত্ত আগে সে তার হতাশা ঝাড়িয়া উঠিয়াছিল,—বীরের মত প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, সে জয়ী হইবে। এখন আবার সে ভাঙ্গিয়া পড়িল। অর্থ কি তার এ প্রতিজ্ঞার?—জয়-পরাজয়ের কতটুকুর উপর তার হাত?—ঐ যে অসীম বলিল, বানের মুখে কাঠ—ঐ তো মানুষের জীবন। কাঠ যতই ভাবুক, চলতে হবে তার স্রোতের বেগে!

অসীম হঠাৎ তার পিঠ চাপড়াইয়া হরিচরণকে চমকাইয়া দিল। সে

বলিল, "ওরে হতভাগা, আমি যে এতগুলো ফিলসফি কপ্চালাম, সে কি তোর মুখ ভার করবার জন্য ?

তত্ত্বকথা শোন হে অর্জ্জুন
ক্লৈব্য তব কর পরিহার,
সত্য বলি মান বর্ত্তমান
যুদ্ধ হের সম্মুখে তোমায় !

নূতন গীতার বার্ত্তা শোন—অতীত মরে গেছে, ভবিষ্যৎ জন্মায় নি, জন্মাবে কি না তা কেউ জানে না। সত্য এক বর্ত্তমান—মরা অতীত বা অভাবী ভবিষ্যতের জন্য জ্যান্ত বর্ত্তমানটাকে নষ্ট করা বুদ্ধির কাজ নয়! কেন ভাববে ? এখন তো তোমার দুঃখ নেই। পয়সা আছে—খরচ কর, খাও দাও আনন্দ কর—পরে না হয় নাই খাবে, দুঃখ নয় পাবেই—তাই বলে আগাম কতকগুলো কষ্ট সইবে কেন ?" বলিয়াই সে গাহিল,—

"হেসে নাও এ দু'দিন বই তো নয়
কার কি জানি কখন সন্ধ্যে হয়।"

এমনি দু'চার লাইন গান, দু' চার লাইন extempore কবিতা অসীমের কথায় প্রায়·ছড়ান থাকিত।

হরিচরণ এ কথায় সায় দিতে পারিল না। সে মুখ ভার করিয়া বলিল, "হাসি আসে কই—সামনে রাক্ষসটা দেখছি হাঁ ক'রে এগুচ্ছে, তাকে দেখে বুকের রক্ত শুকিয়ে যাচ্ছে—তখন যে কাতুকুতু দিলেও হাসি আসে না।"

"কিন্তু আমার আসে ; কেন না, আমি দেখতে পাই, এর ভেতর একটা প্রকাণ্ড পরিহাস। একটা লোক গম্ভীর ভাবে রাস্তা দিয়ে ছুটে চলছে,—ছিমছাম ফিটফাট বাবুটি—যেন ধরাখানা সরা মনে ক'রছে—সে যদি পা পিছলে দড়াম ক'রে আছাড় খেয়ে পড়ে কাদার ভিতর, তাতে হাসি পায় না ? এ তেমনি। কেমন মজার দুনিয়া দেখ দেখি। সবাই ভাবছে এক, আর দিন-রাত হ'চ্ছে তার উল্টো, তবু সবাই ভেবেই চ'লেছে—মনে মনে ভাঙ্গছে গড়ছে। সবাই তো নাচের পুতুল, পেছন থেকে তার টানছে আর কেউ, তাই নাচছেন—তবু কেউ ভাবছেন আমি রাজা, কেউ ভাবছেন আমি উজীর—ভারী চালে চ'লছেন, যেন কত বড় মাতব্বর। ঠিক যেন একখানা ফার্স !"

হরিচরণ ইহাতে খুব উৎসাহিত হইয়া উঠিল না। অসীমের কথাটায় জীবনের নির্ম্মম পরিহাসটা তার চোখে যেন জল্‌জলে হইয়া ভাসিয়া উঠিল। সে কঠোর মূর্ত্তিতে তার হাসি পাইল না,—সে আরও মুশড়াইয়া পড়িল।

তখন অসীম হঠাৎ আর এক সুর ধরিল। তার মুখের হাসি মিলাইয়া গেল, একটা প্রশান্ত-জ্যোতিঃ তার ভিতর ফুটিয়া উঠিল; সে দরদ দিয়া গাহিল,—

"ওরে ভীরু, তোমার হাতে নাই ভুবনের ভার,
হালের কাছে মাঝি আছে, ক'রবে তরী পার।"

হঠাৎ চমক লাগিয়া যেন হরিচরণের মনটা তাজা হইয়া উঠিল। সে মুগ্ধ হইয়া অসীমের কণ্ঠের এ আশার বাণী সমস্ত অন্তর দিয়া গ্রহণ করিল।

গান শেষ হইলে সে বলিল, "কি চমৎকার গাও তুমি অসীম দা'; তোমার মুখে গানের কথাগুলো যেন জ্যান্ত হ'য়ে ওঠে।"

"জ্যান্ত গান হ'লেই গেয়ে তাকে জ্যান্ত করা যায় ভাই। এ গানটা শুকনো তত্ত্ব নয়, একটা জ্যান্ত-হৃদয়ের টাট্‌কা অনুভূতি—তাই এটা প্রাণের ভিতর সোজা গিয়ে বেঁধে। এই কথাটা তো কত লোকে কতবার কত তাকে ব'লেছে, কিন্তু এমনি ক'রে প্রাণের ভিতর পৌঁছুবার মত ক'রে কে কবে ব'লেছে!"

হরিচরণ গুন গুন করিয়া গাহিল, "হালের কাছে মাঝি আছে, ক'রবে তরী পার"—তার পর বলিল, এই কথাই ঠিক দাদা, তুমি আগে যা বলেছিলে সব ভুল। বর্ত্তমানে কাজ ক'রতে হ'বে, দাঁড় টেনে চ'লতে হবে সেটা ঠিক,—সে শুধু এই ভরসায় যে, হালে মাঝি আছে, তরী পার হবে। নইলে শুধু দাঁড় টেনে হাতে ব্যথা করবার মত বুকের পাটা আছে কার?"

"আছে, আমার। কেন না, আমার তরীখান খেয়া-ঘাটের নৌকোও নয়, সওদাগরী জাহাজও নয়, যার একটা বন্দরে পৌঁছুতেই হবে—এ শুধু Rowing clubএর ডিঙ্গি। পারে যাবার কোনও তাড়া নেই এর, দাঁড় টানাই এর শুধু দরকার—তাতেই সুখ! মাঝির ভরসা এতে নেই, কেন না ভেসে চলাই এর কাজ।"

"কিন্তু 'তুফান যদি এসে পড়ে'—"

'কিসের তোমার ভয় ?' কিন্তু মাঝির ভরসায় নয়। ভয় নেই, কেন না, ভাবনা নেই। ভাসাটা চিরদিন চলবে না, ডুবতে হবেই শেষে—সেই ডোবা কোথায় কেমন ক'রে হবে সে সম্বন্ধে কোনও বাচ-বিচার নেই আমার। তাই আমার তরীতে মাঝি নেই।"

"মাঝি নেই ?"

"জানি নে, আছে কি নেই, সে খোঁজের দরকারও বোধ করি না। জানি ভাসছি—ভাসতে হবে—মনের সুখে দাঁড় টেনে চ'লেছি—কোথায় পৌঁছুব জানিনা। জানি সেটা আমার হাত নয়, তাই তার জন্য ভাবনা নেই।"

"তুমি ভগবান মান না, 'তা' হ'লে ?"

"ব'লতে পারি না, কেন না বিষয়টা ভেবে দেখবার কোনও দরকার বোধ করি নি। আমি জানি, জীবন সত্য, এই জীবনটা চালিয়ে নিতে হবে যদ্দূর চলে। ব্যস্, এইটুকু আমার সঙ্গে জগতের সম্পর্ক। এর পেছনে কোথাও কোনও বুড়ো ভদ্রলোক আছেন কি না, সে খোঁজের কি দরকার ?"

"বুড়ো ভদ্রলোক ?"

"ওই তোমরা যাকে বল ভগবান। কথাটা ঠিক নয় কি ? তোমার ভগবান একটি বুড়ো—যিনি সব জেনে শুনে খাতের-জমা হ'য়ে ব'সে আছেন, সমস্ত জগৎকে হুকুম দিচ্ছেন, খাটাচ্ছেন, শাসন ক'রছেন—আর যিনি নিরতিশয় ভালমানুষ, বিন্দুমাত্র বদখেয়াল যাঁর নেই, আর দু'টো-কান্না-কাটি ক'রলে কথা রাখেন, ঘুস নিতেও নারাজ নন—তোমার ভগবানের কথা শুনলে আমার মনে পড়ে আমার ঠাকুর্দ্দার কথা।"

"ছি, ছি, কি সব ব'লছো অসীমদা'। ঠাট্টা-তামাসার একটা সীমা আছে। এমন কতকগুলি জিনিস আছে, যার সম্বন্ধে ঠাট্টা করা চলে না।"

"তামাসাটা কোথায় দেখলে ? এ নিদারুণ সত্যি। তোমার ভগবানকে বিশ্লেষণ ক'রে দেখ, দেখবে তাঁর চেহারা এই—এ ভগবানের সঙ্গে আমার কোনও কারবার নেই।"

"কোনও কিছুই কি মান না তুমি ? এই পৃথিবীটা চলছে কিসে ?"

"বলেইছি তো—সে কথা ভেবে দেখি নি। কিন্তু একটা কথা জানি,

যে, বিজ্ঞান অণু-পরমাণু থেকে বিশাল আকাশ পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র খুঁটিনাটি ক'রে সন্ধান ক'রেও তোমার ঐ বুড়ো-ভদ্রলোকের সন্ধান পায় নি। তিনি যদি সবার দৃষ্টি এড়িয়ে এমন ভাবে লুকিয়ে থাকেন, তবে থাকুন তিনি—আমার তাঁর সঙ্গে কোথাও কারবার নেই।"

"তোমার কারবার বুঝি আগাগোড়া শয়তানের সঙ্গে?"

"সে ভদ্রলোকটিরও দেখা পাইনি আমি, আর কেউ পেয়েছে ব'লে জানি নে, ব'লেইছি তো—আমার কারবার এই জ্যান্ত ভগবানের সঙ্গে, যাকে রোজ চক্ষের সামনে দেখতে পাচ্ছি, রোজ যার সঙ্গে কুস্তি লড়ছি—সে এই বিরাট বিশ্বপ্রবাহ।"

"তা হ'লে একটা কেউ আছে এই বিশ্বপ্রাহের ভিতর, তা' স্বীকার কর?"

"স্বীকার করি এই বিরাট প্রবাহকে—এর তলায় লুকোনো কোনও কিছুকে নয়। দেখতে পাচ্ছি—এ একটা প্রকাণ্ড জ্যান্ত জিনিস, একেবারে concrete—এর সঙ্গে বোঝা-পড়া রোজ করতে হয়। এর বেশী আমার জানবারও দরকার নেই, মানবারও দরকার নেই।"

"তবে যে বড় গাইলে, 'হালের কাছে মাঝি আছে করবে তরী পার'?'

"এই সে মাঝি। তরী সে হয় তো পার ক'রবে—কিন্তু ঠিক আমি যে ঘাটে যেতে চাই সেখানেই যে তার যাবার মতলব, তা নাও হতে পারে। আর আমি চাই বা না চাই, যে ঘাটে তার নেবার, সেখানে সে নেবেই। তাই ভাবনা নেই, ভয়ও নেই।

কথায় কথায় রাত্রি হইয়া গেল, মেসের ঝি আসিয়া খবর দিল, রান্না হইয়াছে। অসীম ও হরিচরণ উঠিল।

২

রাত্রে অনেকক্ষণ শুইয়া হরিচরণ অসীমের কথাগুলি উল্টাইয়া পাল্টাইয়া ভাবিল। তার মনের ভিতর অসীম যেন একটা প্রকাণ্ড তুফান উঠাইয়া তার তলা পর্য্যন্ত সব ওলট-পালট করিয়া দিয়াছে

জীবনে প্রথম আজ সে জীবনটাকে সমগ্র ভাবে আলোচনা করিল—এত দিন এ সব বড় কথা তার মনেই আসে নাই। সে আর্টিষ্ট হইবে, ছবি আঁকিয়া খ্যাতি লাভ করিবে, পয়সা রোজগার করিবে, বড়লোক হইবে, এ স্বপ্ন দেখিয়াছে, এই স্বপ্ন সফল করিবার আয়োজন করিয়াছে; কিন্তু এমন গোড়া হইতে জীবনের সমস্যাটার সামনা-সামনি কখনও হয় নাই। তাই সে যেন একটা গোলকধাঁধায় পড়িয়া কেবলি ঘুরপাক খাইতে লাগিল, কোনও কিছুই ঠিক করিতে পারিল না।

পরের দিন সকালে সে মুখ ধুইয়া দু'টো গুড়-ছোলা খাইয়া যখন তার নিত্যকার্য্য—নিষ্ফল সন্ধানে—বাহির হইবার উদ্যোগ করিল, তখন পূর্ব্বরাত্রের ভাবনা-চিন্তা তার মন হইতে প্রায় মুছিয়া গিয়াছে। আজ কার সঙ্গে দেখা করিবে, কি কথা কহিবে, এই সব সামান্য কথা লইয়া তার মনটা ব্যস্ত রহিল। সকাল বেলাটা আশা করিবার সময়, নিরাশা আসে ব্যর্থ দিবসের শ্রান্ত সন্ধ্যায়। তাই, এখন সে আশায় বুক বাঁধিয়াই বাহির হইল।

বাড়ীর সদর দরজায় পৌঁছিয়া দেখিল, অসীম দাঁড়াইয়া আছে।

"এই যে ভায়া, কোন্ দিকে যাচ্ছ আজ?"

হরিচরণ বলিল, "বৌবাজারে একবার যাব ভাবছি।"

অসীম অমনি তার হাতটা বগলদাবা করিয়া বলিল, "চল যাই।"

"তুমি কোথায় যাচ্ছ অসীমদা?"

"ওই বউবাজারেই। দেখি একবার সেখানে কেমন বউ পাওয়া যায়।"

অসীম আজ আর তার ফিলসফি বলিল না; সে খুব হাল্কা ভাবে হাল্কা

কথা বলিতে বলিতে চলিল। হরিচরণের মনটা তাতে বেশ পাতলা হইয়া গেল।

আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে একটা বাড়ীর সামনে আসিয়া অসীম বলিল, "চল না ভায়া একবার, একটা লোকের সঙ্গে দেখা করে আসি।"

হরিচরণের কোনও তাড়া ছিল না, সে অসীমের সঙ্গে সে বাড়ীতে ঢুকিয়া পড়িল।

যে ঘরে অসীম তাকে লইয়া গেল, সেখানে বেশ একটা ছোটখাট মজলিস বসিয়াছিল। ঘরখানা অপরিচ্ছন্ন—তার এক পাশে একখানা তক্তপোষ, একধারে দু'খানা চেয়ার, একটা আলমারী ভরা বই—আর ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হরেক রকমের জিনিস—ছবি [illegible], [illegible], চায়ের বাসন, খাবারের ঠোঙা প্রভৃতি।

তক্তপোষের উপর শুইয়া একজন খবরের কাগজ পড়িতেছিল, তার পাশে বসিয়া আর একজন চা খাইতেছিল। চেয়ার দু'খানা দখল করিয়া বসিয়াছিল আর দু'জন, তাদের হাতে চায়ের পেয়ালা, কিন্তু মুখে একজনের সিগারেট আর একজনের—বক্তৃতা।

অসীম আসিতেই সবাই কোলাহল করিয়া তার সম্বর্দ্ধনা করিল। তার পশ্চাতে হরিচরণকে দেখিয়া তাদের উচ্ছ্বাস কতকটা শমতা প্রাপ্ত হইল।

তক্তপোষে বসিয়া যে চা খাইতেছিল, সে হরিচরণের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে অসীমের দিকে চাহিল। অসীম পরিচয় দিল, "ইনি আমার তরুণ বন্ধু হরিচরণ পাল, কৃষ্ণনগরের সুবিখ্যাত শিল্পী গদাই পালের পৌত্র—আমাদেরই একজন। ওঁর মনে বাসনা—উনি artist হবেন, তাই তোমার কাছে নিয়ে এলাম সুরেন দা'।"

সুরেন বলিল, "মাপ ক'রবেন মশায়, প্রথম পরিচয়, কিন্তু—মরবার কি আর পথ পেলে না? এমন বেয়াড়া বাসনা কেন হ'ল বল দিকিনি।"

হরিচরণ এ সম্ভাষণে ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়া গেল, সে কিছু বলিতে পারিল না।

অসীম বলিল, "এ আর বুঝছো না, এ তোমার সেই বুড়ো ভদ্রলোকের কারসাজী। এর প্রতিকার নেই।"

সুরেন। কিন্তু বিনা চেষ্টায় হাল ছাড়তে পারছি না ভাই। শোন

ভায়া, সত্যি সত্যি আর্টিষ্ট যদি হও তুমি, তবে তোমার এ ঘাটে মরতেই হবে, তার চারা নেই। কিন্তু সাবধান করে দিচ্ছি—এতে খেতে পাবে না।

হরিচরণ এ কথায় বিষম দমিয়া গেল।

অসীম হাসিয়া বলিল, "দেখ সুরেন দা' এতটা হিংসে ভাল নয়। পাছে ও তোমার পসার কেড়ে নেয়, তাই মিছে ভাঙ্‌চি দিচ্ছ! ওকে বিশ্বাস ক'রো না হরিচরণ। দাদার আমার সত্যি কথা বলাটা বেশী আসে না।"

সুরেন। যদিচ কথাটা অস্বীকার ক'রতে পারছি না, তবু এ কথাও স্বীকার করো অসীম, যে, মাঝে মাঝে সত্যি কথা বলে থাকি—এ বিষয়ে আমার কোনও ধরা-বাঁধা নিয়ম নেই।

অসীম। সে যাই হোক, একে তোমার সাগ্‌রেদ ক'রে নিতে হবে।

সুরেন। বেশ, লক্ষীছাড়ার দল পুরু করবার মতলব থাকে তো এসো। আজ থেকেই ভর্ত্তি হ'য়ে পড়। একেবারে চা' থেকে সুরু করা যাক, কি বল? অসীম, ওই টি-পটটায় আছে দু-পেয়ালা আন্দাজ, ঢেলে নেও ভাই।

অসীম দু-পেয়ালা চা ঢালিয়া একটা নিজে লইল একটা হরিচরণকে দিতে গেল। হরিচরণ বলিল, "আমি চা খাইনে।"

অসীম। ওরে বাপ রে, ও পাপ কথা সুরেনদার ঘরের আশে-পাশে কোথাও ব'লো না, ও খুন করে বসবে।

হরিচরণ চায়ের পেয়ালা লইয়া খাইতে আরম্ভ করিল।

সুরেন একজন প্রতিভাশালী চিত্রকর, কিন্তু তার চিত্র যথেষ্ট অর্থকর নয়। সে তার আর্টকে খাটো করিয়া সস্তা পয়সা রোজগার করিতে চায় না, তাই সে বাজে ছবি আঁকে না, নিরবচ্ছিন্ন কলালক্ষ্মীর অনুশীলন করে। একদিন এক বন্ধু তাকে এক বড়লোকের কাছে লইয়া গিয়াছিল। বড়লোকটি তাকে তাঁর প্রতিকৃতি আঁকিতে বলিয়াছিলেন। বিস্তর পয়সা পাওয়ার সম্ভাবনা সত্ত্বেও সুরেন তাঁর ছবি আঁকিতে স্বীকার করে নাই।

তার বন্ধু অনুযোগ করিয়া বলিয়াছিলেন, "হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেললে?"

সুরেন বলিল, "প্রাণের দায়ে।"

"কি রকম?"

"ভদ্রলোকের চেহারা যেমন, তাতে ঠিক মানান সই ক'রে ছবি আঁকলে ভদ্রলোক ভাবতেন সেটা caricature। তখন লক্ষ্মী আসা দূরে থাক্‌, প্রাণ নিয়ে পালাবার পথ পেতাম না।"

"কেন? কুৎসিৎ মূর্ত্তির কি ছবি হয় না?"

"হবে না কেন? কিন্তু তাতে পরিকল্পনা ক'রতে হয় একটা দানব দৈত্য বা রাক্ষসের। ছবি তো শুধু ফটোগ্রাফ নয়, এর ভিতর ফুটিয়ে তুলতে হবে character—ওই চেহারায় character ফোটাতে পারি, সে একটা খুনের। তা হ'লে ছবিখানা হ'ত ভাল, কিন্তু বেচতে হ'ত ওঁর শত্রুর কাছে।"

তা ছাড়া সুরেনের আর একটা দোষ ছিল এই যে, বাজারে যে সব আর্টিষ্টের খুব বেশী খ্যাতি, তাদের সে দু-চক্ষে দেখিতে পারিত না। তাদের আদর্শ বা অঙ্কন-পদ্ধতির সঙ্গে তার সহানুভূতি ছিল না। সে তার ছবি আঁকিত একটা স্বতন্ত্র বিশিষ্ট পদ্ধতিতে, তার আদর দেশে ছিল না।

তাই সুরেনের ছবির আদর বেশী ছিল না, তার রোজগারও ছিল সামান্য। কোনও মতে কায়ক্লেশে তার জীবনযাত্রা চলিয়া যাইত।

সুরেনের বয়স ত্রিশের উপর, কিন্তু সে ছিল রাজ্যের ছোকরাদের বন্ধু। তার মধ্যে কেউ বা ছাত্র, কেউ বা কেরাণী, কেউ বা প্রাইভেট টিউটার—সবাই সমান লক্ষ্মীছাড়া। ট্যাঁকে কড়ি তাদের প্রায় থাকে না, আহারটাও যে নিয়ম করিয়া তিন-শ' পঁয়ষট্টি দিনই হয় এমন নয়। কিন্তু সে জন্য কারও উদ্বেগ নাই। সুরেনের এই ঘরটিতে বসিয়া তারা পেয়ালার পর পেয়ালা চা উজাড় করে, আর কথা কয় সব বড় বড়। কেউ বা আর্টিষ্ট, কেউ বা কবি, কেউ বা কথা-সাহিত্যিক, আর সবাই সমালোচক—কিন্তু তাদের বিপুল প্রতিভার প্রতিষ্ঠার জন্য সবাই চাহিয়া আছে ভবিষ্যতের পানে।

সুরেনের তরুণ বন্ধুদের মধ্যে রমেশের অবস্থা সবচেয়ে ভাল, আর বয়সে সে সবচেয়ে ছোট। সে খুব ভাল খেলোয়াড়,—ফুটবল, ক্রিকেট, হকি ও টেনিসে তার সমান অধিকার। তার খেলা কাজেই সারা বছর ধরিয়াই চলে, আর খেলার জন্য সে বেশ দু-পয়সা রোজগার করে। তার একটা চাকরী আছে—মাসে পঞ্চাশ টাকা তার মাহিনা; কিন্তু আফিসের চেয়ে মাঠেই সে বেশী দিন কাটায়। এ চাকরী তাকে দিয়াছেন এক খেলার

মুরুব্বি, তাঁর ক্লাবে সে খেলিবে বলিয়া। তা ছাড়া মাঝে মাঝে সে বেশ মোটা টাকা লইয়া এদিক সেদিক খেলিতে যায়—তাতেও তার মনিবের আপত্তি নাই।

এতগুলি লক্ষ্মীছাড়ার বন্ধু রমেশের রোজগারের টাকা তার সিন্ধুকে উঠিবার বা ব্যাঙ্কে জমা হইবার অবসর পাইত না। বন্ধুদের খাওয়ান দাওয়ান, তাহাদিগকে লইয়া excursion-এ যাওয়া, সিনেমা দেখান, এমনি সব খরচের অঙ্ক তার বাঁধাই ছিল। তা ছাড়া, অভাবে পড়িলে বন্ধুরা তার কাছে হাত পাতিতে কোনও দ্বিধা করিত না। রমেশও ইহাতে কোনও দিন কোনও কুণ্ঠা বোধ করিত না। শুধু দু'হাতে এমনি করিয়া টাকা ছড়াইবার আনন্দই ছিল তার কাছে টাকা রোজগারের একমাত্র প্রয়োজন।

নামজাদা খেলোয়াড় হইয়া কিন্তু রমেশের তৃপ্তি ছিল না। তার এই খেলার খ্যাতিতে সে রীতিমত চটিত। খবরের কাগজে যে দিন তার খেলার সুখ্যাতিসহ তার ছবি ছাপা হইত, সেদিন সে প্রাণ খুলিয়া দেশের লোককে গালাগালি দিত। সে বলিত, "বেটারা আহ্লাদে আটখানা হ'য়েছে, আমায় মাথায় তুলে নাচতে লেগেছে, কি না আমি লম্বা লম্বা কিক্ ক'রতে পারি। হতভাগারা চেয়ে দেখবে না একবার যে, এত বড় একটা কবি এই খেলোয়াড়ের ভিতর মাঠে মারা যাচ্ছে।" সে কবিতা লেখে, আর তার মনে আশা আছে যে, এক দিন লোকে তার কবিত্বের যোগ্য সমাদর করিবে। সেই সমাদরের আগমনীর সুরের জন্য সে কাণ পাতিয়া থাকে, শুনিতে পায় সে শুধু তার খেলার জয়ধ্বনি—রাগে সে ফুলিতে থাকে। তাই সে খেলোয়াড়দের প্রশংসামুখর সঙ্গ ছাড়িয়া ছুটিয়া আসে সুরেনের এই শান্ত-কুলায়ে—এখানে সে তার কবিতা পড়ে, আর কবিতার প্রশংসা শুনিতে পায়।

আজ একটু আগে সে তার "নির্ঝর" নামে একটি নূতন কবিতা পাঠ করিয়াছিল, তারই আলোচনা চলিতেছিল। হরিচরণ সহ অসীমের হঠাৎ আবির্ভাবে আলোচনাটা স্থগিত হইয়া গিয়াছিল। সে হাঙ্গামা চুকিলে সুরেন বলিল, "ওহে, রমেশ আজ যে একটা কবিতা লিখেছে—চমৎকার। দেখ।" বলিয়া কাগজখানা অসীমের হাতে দিল। অসীম পড়িতে লাগিল। পড়িতে পড়িতে তার মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া

উঠিল। সে বলিল, "Fine—extraordinary! নির্ঝরের এ কল্পনা অপূর্ব্ব!

ভিখারী নিঝর
জলকণা মাগি ফিরে
ঘর ঘর ঘর।

অকরুণ মেঘ তায়
করুণায় পড়ে ঝরি,
তুষার গলিয়া দেয়
কূলে কূলে বুক ভরি।
ছোট সে নিঝর!

পুলকেতে সারা অঙ্গ
কাঁপে থর থর—
শিলার ডিঙ্গায় যায়
টিলা ভাঙ্গে পায়
ধরণীর বুকে পড়ি
আপনা বিলায়।

শুধু দিয়েই তার আনন্দ! কি সুন্দর!—perfect Bohemian! ধন্য কবি, ধন্য তোমার এ কল্পনা!" বলিয়া অসীম রমেশকে বুকের ভিতর জড়াইয়া ধরিল।

রাজীব রায় একজন ভাবী ঔপন্যাসিক—সে বলিল, "নির্ঝরের এমন কল্পনা কোনও দেশে কোনও কবি করেনি। এর পাশে রবি বাবুর "নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ" একেবারে flat।"

ভূপেন মুখার্জ্জি বাঙ্গলার ভবিষ্য Taine, সম্প্রতি একটি খবরের কাগজের প্রুফ সংশোধন করে। সে ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের সঙ্গে তুলনা করিল—ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ ভাসিয়া গেল।

এমনি করিয়া ক্রমে সাব্যস্ত হইল যে, এমন কবিতা ন ভূত ন ভবিষ্যতি।

সুরেন বলিল, "কিন্তু কাল যদি এ কবিতা কাগজে বেরোয়, তবে

শুনবে, মাসিক-সাহিত্য সমালোচনায় প্রাজ্ঞ সমালোচক এক কথায় একে বলবেন—রাবিশ! এই আমাদের দেশ!"

ভূপেন বলিল, "ঐসা দিন নহী রহেগা। এই সমালোচনার ধারা একদম উল্টে দেব দাদা! কোনও ভয় নেই ভায়া, লিখে যাও ভবিষ্যতের কবি তুমি, আমি হব তোমার সমালোচক—অন্ধ দেশকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে ছাড়বো। ক'দিন আমাদের চেপে রাখবে এই বুড়োর দল।"

গল্পে গল্পে অনেক বেলা হইয়া গেল। সুরেন অসীমকে বলিল, "কি হে, তোমার কলেজের তাড়া নেই বড় আজ?"

অসীম শান্ত ভাবে হাসিয়া বলিল, "না দাদা, সে পাঠ উঠেছে।"

"তার মানে?"

"মানে অত্যন্ত সোজা, কলেজ ছাড়লাম আজ থেকে।"

"কেন?"

"রেস্ত নেই ব'লে। দেশে যে বিপুল সম্পত্তির জোরে কলেজে যাওয়া আসার অভিনয় চলছিল, সেটা চুকে গেছে। এখন রোজগার না ক'রলে, মেসের পাটও ওঠাতে হবে।"

সবাই ভয়ানক ব্যস্ত হইয়া উঠিল। অসীম অবস্থাটা তাদের খুলিয়া বলিল। সকলেই দুঃখিত হইল, কিন্তু অসীম বলিল, "আমি যে ভাই, এতে কি আরাম বোধ ক'রছি, কি ব'লবো। ঐ বিষয়টুকু যেন আমায় বন্দী ক'রে রেখেছিল। ওর থেকে দু'টো টাকা আসতো, তাই কলেজে গিয়া কতকগুলি প্রফেসারের অনর্থক বক্তৃতা শুন্‌তে হ'ত। এখন সে উৎপাত চুকে গেল—এখন আমি স্বাধীন, যা খুসী ক'রবো, যেখানে খুসী যাব।"

সুরেন বলিল, "সে হ'তে পারতো, যদি তোমার বিষয়টুকুর সঙ্গে উদরটুকু যেত। সেটা ভরবার কি উপায়?"

"সে ঠিক ক'রে ফেলেছি। আমার গল্পগুলো এক সঙ্গে ক'রে ছাপার ঠিক ক'রেছি।"

"তোমাকে discourage ক'রতে চাই না, কিন্তু সেগুলো পয়সা দিয়ে ছাপবে এমন পাব্‌লিশার বাঙ্গলা দেশে আছে কি?"

"না থাকে তাদের দুর্ভাগ্য!" বলিয়া অসীম দারুণ-ঔদাস্যের সহিত ভূপেনকে বলিল, "ওহে, শুনলাম, তোমার কাগজ না কি উঠে যাচ্ছে?"

"এই রকম একটা গুজব শুনছি বটে।"

"তার পর?"

"তার পর ঠিক তোমার মত।"

"উত্তম, সুরেন দা', তোমার লক্ষ্মীছাড়ার দল দেখ্‌ছি ষোলকলায় পূর্ণ হ'য়ে উঠছে।"

ইহাদের কথাবার্ত্তা শুনিয়া হরিচরণের তাক লাগিয়া গেল। বিষয় বিশেষ না থাকিলেও হরিচরণ অন্তরে অন্তরে বিষয়ী লোক। হিসাব করিয়া খরচ করা সে শিখিয়াছে শৈশব হইতে, আর অনাগতের হিসাবে খতাইয়া বর্ত্তমানকে গড়া তার জীবনের প্রথম নীতি। কিন্তু এই একদল লোক ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একেবারে বেপরোয়া, কাল কি হইবে আজ সে সম্বন্ধে চিন্তা করে না। অনশনের স্পষ্ট সম্ভাবনা সম্মুখে করিয়া ইহারা পরম-আনন্দে কাব্যালোচনা করে—ইহাদের চরিত্র সে বুঝিতে পারিল না। কিন্তু এদের, বিশেষতঃ অসীমের এই নির্ব্বিকার বর্ত্তমানপরতা তাহাকে ভারী মুগ্ধ করিল। এ এক অপূর্ব্ব সন্ন্যাস, আশ্চর্য্য বৈরাগ্য! সে মনে মনে বুঝিল, ইহা নিছক বেকুবী, কিন্তু জিনিসটা জোরে তার মনটা আঁকড়িয়া ধরিল।

ইহার পর সে দেখিল অসীমের বইখানা সত্য সত্যই একজন প্রকাশক—জলের দরে হইলেও—নগদ দাম দিয়া কিনিয়া লইল। আর ভূপেনের কাগজ উঠিয়া গেলেও তার অন্যত্র চাকুরী জুটিল। সে ভাবিয়া মরিত কবে বা ইহারা না খাইয়া মরে; কিন্তু মাসের পর মাস, বছরের পর বছর কাটিয়া গেল, তাদের অর্থকষ্ট অনেক হইল, কিন্তু তবু তাদের দিন এমনি একরকম চলিয়া গেল।

সে এই ব্যাপার দেখিয়া অবাক্ হইল।

বছর দুই পরে একদিন সে অসীমকে বলিল, "যতই বল দাদা, ভগবান আছেন, আর তিনি ঠিক তোমার বুড়ো ভদ্রলোক নন!"

"তাই না কি? কোন্ অকাট্য যুক্তির বলে এ কথা ঠিক ক'রলে ভাই? সৃষ্টির আদি থেকে এ পর্য্যন্ত অনেক লোকেই কথাটা যুক্তি দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টা ক'রছে, আমার মত এই যে তাদের কোনও যুক্তিই টেঁকসই নয়। তুমি কি নূতন যুক্তি বের ক'রলে শুনি।"

"ভগবান যদি নেই, তবে তোমার চ'লে যাচ্ছে কেমন ক'রে? ওই

যে বলে 'ভাগ্যবানের ভার ভগবান বয়' সে কথা আমি যে প্রত্যক্ষ দেখতে পাচ্ছি।"

"ওঃ, এই—তা বেশ, এ যুক্তির মৌলিকতা আছে। কিন্তু ভায়া, ভগবানকে বুড়ো-ভদ্রলোক ক'রতে বরং রাজী আছি, কিন্তু আমার বোঝা বইবার গাধা ক'রতে প্রস্তুত নই। আমার যে চলে যাচ্ছে তার জন্য এমন অসম্ভব কল্পনা করবার দরকার নেই, কেন না তার প্রত্যক্ষ হেতু হ'চ্ছেন রায়-কোম্পানী। তাঁরা আমার বই ছেপে ছেপে দেউলে হ'য়ে যেতে পারেন—আর তার পরও যদি আমার চলে তার হেতু হবে হয় তো এই যে, আর একটা বোস-কোম্পানী কি ঘোষ-কোম্পানী গজাবে। ভগবানের হাত এর ভিতর দেখতে পাচ্ছি না ভায়া।"

ভূপেন তখন তক্তপোষে পড়িয়া ঘুমের জোগাড় করিতেছিল। সে উঠিয়া বসিল, বলিল, "শুনহে অসীম রায়—তোমার যুক্তি আমি মানি না—ভগবান আছেন, তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎকার হ'য়েছে।"

"So glad to hear। তাঁর ঠিকানা টুকে রেখেছ? একবার call ক'রতাম।"

"সেই তো মুস্কিল, ভদ্রলোক ঠিকানা রেখে যান না, কিন্তু তবু আছেন তিনি নিশ্চয়—সেটা আমি হাড়ে হাড়ে বুঝেছি।"

"যথা"—

"দেখ, এই ছাব্বিশ বছর বয়স হ'তে চ'ল্ল—এর ভিতর কত রকম প্ল্যান ক'রেছি, কত জোগাড়-জাগাড় ক'রে সব প্রায় ঠিক ক'রে এনেছি, এমনও দিন হ'য়েছে যখন মনে হ'য়েছে আর কেউ ঠেকাতে পারলে না—কিন্তু নিয়ম ক'রে সবগুলি প্ল্যান শেষ-মুহূর্ত্তে ভণ্ডুল হ'য়ে গেছে। কেন? তুমি ব'লবে accident। কিন্তু আমার বেলায়ই এই accidentগুলো নিয়ম ক'রে হ'চ্ছে কেন? এর ভিতর একটা কুচক্রীর গভীর ষড়যন্ত্র আছে—আর সে কুচক্রী মানুষ নয় এটা ঠিক। সুতরাং ভগবান আছেন, আর তাঁর কাজ হ'চ্ছে আমাদের সব সঙ্কল্প ব্যর্থ করা।"

"ওহে হরিচরণ, দেখ, এ পাপিষ্ঠ আমার চেয়ে তোমার ভগবানের বড় শত্রু—আমি শুধু তাকে বধ ক'রেছি—এ তাকে গাল দিচ্ছে—ভগবান কি না এত বড় পাপিষ্ঠ যে অনর্থক একটা নিরপরাধ লোককে এমনি ক'রে ঠকায়।"
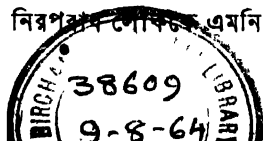
হরিচরণ বলিল, "তা' করেন তিনি। জান না দাদা, তিনি দর্পহারী! যখন মানুষ নিজেকে বড় শক্তিমান্ মনে করে, ভাবে—সব ভাঙ্গাগড়া তার হাত, তখন তিনি এমনি ক'রে তা'র দর্পচুর্ণ করে তাকে মনে করিয়ে দেন সে কত ছোট।"

"তাই যদি তাঁর অভিসন্ধি, তবে আমার বেলায় তাঁর এ পক্ষপাত কেন?"

"সে কথা তিনি জানেন। কিন্তু তাই বা হবে কেন? তোমার তো অহঙ্কার নেই—তুমি তো নিজেকে ভাঙ্গাগড়ার মালিক ব'লে ভাব না—তুমি যে বানের মুখে কাঠ।"

হরিচরণের কথার ভিতর এমন একটা গভীর বিশ্বাসের সুর বাজিয়া উঠিল যে অসীম মুগ্ধ হইয়া তার দিকে চাহিল; দেখিল, হরিচরণের চক্ষু ছল ছল করিতেছে, আবেগে তার মুখ ছাইয়া গিয়াছে।

অসীম হাসিয়া বলিল, "বেশ ভাই বেশ!—না, আর তোমার কাছে ভগবানকে নিয়ে তামাসা করা চলবে না। তোমার এ বিশ্বাসটা এমন সুন্দর যে, এতে ঘা দিতে মায়া হয়।'

৩

সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ভাবে সুরেনের একখানা ছবিতে তার নাম ফাটিয়া পড়িল। অনেক টাকায় ছবিখানা বিক্রী হইল, আর কয়েক মাস যাইতে না যাইতে এক স্বাধীন-রাজ্যের কলাভবনে তার একটা মোটা মাইনার চাকরী জুটিয়া গেল।

হরিচরণের সঙ্গে সাক্ষাতের তিন বৎসর পরে সুরেন তাহাদের কাছে বিদায় লইয়া, তার সকল বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করিয়া তার কর্ম্মস্থলে চলিয়া গেল। তার লক্ষ্মীছাড়া বন্ধুর দল সকলেই তার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া অবিলম্বে সেই দেশে যাত্রা করিত, কিন্তু সুরেন যাইবার পূর্ব্বে একটা কাণ্ড করিয়া ফেলিল, তাতে বন্ধুরা থামিয়া গেল।

একটি বড়লোকের মেয়েকে চিত্রবিদ্যা শিক্ষা দিবার অজুহাতে সুরেন কয়েক মাস হইল তাঁর বাড়ীতে যাওয়া আসা করিতেছিল। হঠাৎ তার যাইবার তিন দিন আগে সুরেন সেই মেয়েটিকে বিবাহ করিয়া ফেলিল। সুরেনের লক্ষ্মীছাড়া বন্ধুরা অবশিষ্ট তিন দিন এই মহিলাটির সঙ্গে যেটুকু আলাপের সুযোগ পাইল, তার ভিতরই তারা আবিষ্কার করিল যে সুরেন সম্বন্ধে তাঁর যে মতই থাকুক, সাধারণভাবে লক্ষ্মীছাড়াদের প্রতি তাঁর বিশেষ পক্ষপাত নাই। কাজেই তারা থামিয়া গেল।

হরিচরণ তিন বৎসরে সুরেনের কাছে যাহা শিখিয়াছিল তাহা সামান্য নয়।. তার জমা পুঁজি যাহা ছিল, এই দুই বৎসরে তাহা প্রায় নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে দেখিয়া, আর বেশী শিক্ষালাভের কোনও চেষ্টা না করিয়া, সে স্বয়ং চর্চ্চা করিয়া ক্রমে সুবিধামত কিছু রোজগার করিবে স্থির করিল।

সে প্রথম গুরুর শিক্ষা শিরোধার্য্য করিয়া টাকা রোজগারের সহজ পন্থা অনুসরণ না করিয়া ভাল ছবি আঁকিবার চেষ্টা করিল। অনেক কষ্ট করিয়া তিন চারখানা ছবি আঁকিয়া সে দ্বারে দ্বারে ঘুরিল—তার খরিদ্দার জুটিল না। তার পর সে পেটের দায়ে বাজারের চাহিদা অনুসারে

মাসিকপত্রের অঙ্গবর্দ্ধনের উপযোগী ছবি আঁকিতে লাগিল। ইহাতেও সে বেশী সুবিধা করিতে পারিল না। মাসিকপত্রের সম্পাদক যাঁরা ছবি বাছাই করেন, তাঁরা খুব বড় কলাবিদ্ নন। কাজেই তাঁরা হয় নাম দেখিয়া ছবি নেন, না হয় একেবারে যা' তা' ছাপেন। কাজেই তাঁদের কাছে হরিচরণ চট্ট করিয়া জামাইয়ের আদর পাইল না, ইহা বলা বাহুল্য।

অনেকগুলি ছবি লইয়া ফিরিবার পর একদিন হঠাৎ হরিচরণের একখানা ছবি "উদাসী" সম্পাদকের চোখে লাগিয়া গেল। তিনি নগদ পাঁচ টাকা মূল্যে ছবিখানি কিনিলেন, আর উপরি দিলেন ছবির প্রশংসা।

সেদিন হরিচরণকে পায় কে। এই পাঁচ টাকা সে পাইয়াছে ভাগ্যদেবীর ভাণ্ডারে সিঁধ কাটিয়া। এখন সিঁধের ফাঁকটা বড় হইতে যা' সময়। তার মনে আর কোনও সন্দেহ রহিল না যে, লক্ষ্মীর পুরীতে তার এই প্রথম পদক্ষেপ তার চির সৌভাগ্যের সূত্রপাত মাত্র। সম্পাদক যে ছবির এত সমাদর করিলেন, তার চেয়ে অনেক ভাল ছবি আঁকিবার শক্তি তার আছে। তার প্রতিভার যখন পূর্ণ-বিকাশ হইবে, তখন সমস্ত দেশ তার সমাদর করিবার জন্য পাগল হইয়া উঠিবে, দিকে দিকে বাজিয়া উঠিবে তার প্রশংসার দুন্দুভিনাদ। সেই ভাবী সুরের আভাস তার কাণে আজই ধ্বনিত হইয়া উঠিল—সে পাঁচটি টাকা হাতে করিয়া উৎফুল্ল হৃদয়ে বাড়ী ফিরিল।

পর মুহূর্ত্তেই তার প্রাণটা দমিয়া গেল দেশের কয়েকখানা চিঠি পড়িয়া।

বাড়ী হইতে হরিচরণ প্রতিজ্ঞা করিয়া বাহির হইয়াছিল, মানুষ না হইয়া দেশে ফিরিবে না। সে প্রতিজ্ঞা সে রক্ষা করিয়াছিল। মাঝে মাঝে স্ত্রীর খবর নেওয়া ছাড়া সে দেশে কাহাকেও চিঠিও লিখিত না। তার অবস্থা সে কাহাকেও জানাইত না, ভাইদের অবস্থাও জানিতে চেষ্টা করিত না।

সে সংবাদ পাইয়াছিল, কয়েক মাস পূর্ব্বে তার শ্বশুর মারা গিয়াছেন। তার পর শাশুড়ীও স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। শ্বশুরের মৃত্যুর পর তার দুই শ্যালক চৈতন পালকে খবর পাঠাইয়াছিল, তোমাদের বউ তোমরা লইয়া যাও, আমরা তাহাকে রাখিতে পারিব না। চৈতন তার উত্তরে লিখিল, 'যার বউ সে নিক গে, আমরা তার কি জানি ?'

এই ব্যাপার লইয়া বাদানুবাদ মন-কষাকষি কিছুদিন চলিল। আর বিশে'র কোনও দিন শ্বশুরবাড়ী যাইবার সম্ভাবনা যতই সুদূর-পরাহত মনে হইতে লাগিল, ততই ভাইয়ের ঘরে তার বাস সুকঠিন হইয়া উঠিল। তার দুই ভাজ শুধু তাকে নিরন্তর বাক্যবাণে বিদ্ধ করিয়াই ক্ষান্ত হইতেন না, শুধু তাকে কেনা দাসীর মত সংসারে খাটাইয়া খুসী হইতেন না, ক্রমে ঠোনাটা চড়টা চাপড়টা লাগাইতে লাগিলেন।

এক দিন বড়ভাজের অত্যাচারের আতিশয্যে বিশে রাগ সামলাইতে পারে নাই—সে তার বাপ তুলিয়া গালি দিয়াছিল। বড়-বউ তো তাতে সপ্তমে চড়িয়া গেলেনই, বড় ভাই সেই কথা শুনিয়া আসিয়া বিশেকে খুব ক' ঘা দিয়া তাকে যা নয় তাই বলিয়া গালি দিয়া গেল।

বিশে' তখন নিজে জোগাড় করিয়া শ্বশুরবাড়ী গিয়া উপস্থিত হইল, বলিল, শ্বশুরের ভিটায় পড়িয়া জায়ের দাসীত্ব করিয়া খাইবে, তবু ভাইয়ের ঘরে আর সে আসিবে না।

চৈতন তাকে দেখিয়া মুখ ফিরাইয়া বসিল, যে সঙ্গে আসিয়াছিল তাকে বলিল, "ওকে এখেনে এনেছো কেন? বাবুর কাছে ক'লকেতায় নিয়ে যাও—যেখানে বাবু গেছেন বড়লোক হ'তে সেখানে নিয়ে যাও।"

বিশের বড় জা' কিন্তু তাকে আদর করিয়া ঘরে তুলিল, বলিল "নইলে অকল্যাণ হবে।"

চৈতন তার স্ত্রীকে ভয় করিত। তার কাজে প্রতিবাদ করিতে পারিল না, কিন্তু সে হরির কাছে একখানা কড়া চিঠি লিখিয়া দিল যে, চৈতন হরির স্ত্রীর ভার বহিতে পারিবে না। সে যখন স্বাধীন হইয়াছে, তখন তার স্ত্রীকে লইয়া যা'ক। বিশেও অনেকগুলি কলম ভাঙ্গিয়া তার দুর্দ্দশার কথা খোলসা করিয়া হরিচরণকে লিখিল। শেষে লিখিল "তুমি যদি আমাকে তিন দিনের মধ্যে নিয়ে না যাও তো গলায় দড়ি দিব।"

হরিচরণ মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। তার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে কোনও দ্বিধা হইল না। পত্র দু'খানা পড়িয়া সে তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া উঠিয়াছিল এবং স্ত্রীকে কলিকাতায় আনিবার সঙ্কল্প করিতে তার এক মুহূর্ত্তও সময় লাগে নাই। কিন্তু সে তার সমস্ত জমাপুঁজীর হিসাব করিয়া দেখিল যে কৃষ্ণনগর যাতায়াতের খরচ বাদে তার হাতে মাত্র পাঁচসিকা অবশিষ্ট

থাকে। এই পাঁচসিকার ভরসায় স্ত্রীকে আনিয়া সংসার পাতিবার কল্পনা তার কাছে বাতুলতা বলিয়া মনে হইল।

কিন্তু ভাবিবার সময় ছিল না। অসীমের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া সে তৎক্ষণাৎ বাহির হইয়া পড়িল একখানা ঘরের সন্ধানে। অনেক খুঁজিয়া একখানা ঘর পাইল একটু অপেক্ষাকৃত ভাল ধরণের একটা বস্তীতে। টিনের ঘর, পাকা মেঝেওয়ালা ছোট্ট একখানা ঘর—কিন্তু ঘরখানা নূতন, আর পাশে যে সব ভাড়াটিয়া, তারা গৃহস্থ গোছের ভাল লোক। মাসিক পাঁচ টাকা ভাড়ায় ঘর ঠিক করিয়া, একটি টাকা অগ্রিম দিয়া সে কৃষ্ণনগরে চলিয়া গেল।

সেখানে তার কিছু বাসন-পত্র সিন্ধুক খাট প্রভৃতি আসবাব ছিল। তার সামান্য কিছু সঙ্গে আনিল, বাকী সে দশ টাকায় বিক্রী করিল। তারপর সে বিশেকে লইয়া, নগদ দশ টাকা হাতে করিয়া কলিকাতায় ফিরিল।

খুব রাগারাগি করিয়া সে চলিয়া আসিল, কিন্তু গাড়ীতে উঠিয়াই তার রাগ পড়িয়া গেল, তার স্ত্রীর ভরা-যৌবনের অপূর্ব্ব লাবণ্যরাশির দিকে চাহিয়া। দুঃখ-দুর্ভাবনার কথা ভাবিবার সময় হইল না. ভবিষ্যতের কথা মনে হইল না, একটা পরম লোভনীয় রমণীয় বর্ত্তমান তাকে অভিভূত করিল। সে চট্ করিয়া বিশেকে তার বুকের ভিতর জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "আর দুঃখ নেই তো ছোট-বউ?"

ছোট-বউ লজ্জানত মুখে মৃদুস্বরে শুধু বলিল, "না।"

কলিকাতায় তার ছোট ঘরে বিশে' মনের আনন্দে তার সুখের সংসার পাতিল।

৪

বড় আনন্দে তাদের কয়েক দিন কাটিল। বিশে'র ভরা-যৌবন, ঢল ঢল রূপ, হাসিভরা মুখ, কৌতুকভরা চিত্ত। হরিচরণের মন চাহিয়া চাহিয়া তৃপ্তি পাইত না।

আকাশের বিদ্যুতের মত চঞ্চল বিশে', দুষ্ট শিশুর মত কৌতুকে ভরা। সে এত দিক দিয়া হরিচরণের মনে আনন্দের ফোয়ারা ছাড়িতে লাগিল যে বেচারী একেবারে হাবু-ডুবু খাইতে লাগিল।

হরিচরণ ছবি আঁকিতে বসে, বিশে' যায় রান্না করিতে—একই ঘরের দুই কোণায় দুইজন। হরিচরণের চোখ ছবি হইতে ফিরিয়া উনুনের পাশে ঘুরিয়া বেড়ায়। ডালে কাঠি দিতে দিতে বিশে' আড়নয়নে স্বামীর দিকে চায়। চোখে দেখা হয়, ফিক করিয়া হাসিয়া বিশে' ঘোমটায় মুখ ঢাকিয়া ফেলে।

ছবি পড়িয়া থাকে। হরিচরণ উঠিয়া আসে, জোর করিয়া মুখের কাপড় সরাইতে। বিশে' প্রাণপণে মুখের উপর কাপড় চাপিয়া ধরিয়া খিল খিল করিয়া হাসে। শেষে হাত ছাড়িয়া দেয়—আবার হাসে।

ডাল ফুটিয়া উপচাইয়া পড়ে, চকিত হরিণীর মত বিশে' হরিচরণের হাত ছাড়িয়া সেদিকে নজর দেয়। হরিচরণ হাসিতে হাসিতে পটের কাছে ফিরিয়া যায়।

ফোঁড়নের ঝাঁঝে হরিচরণ কাশে, বিশে খিল খিল করিয়া হাসিয়া গড়াইয়া পড়ে। তার পর ডালটা কড়াইয়ে ছাড়িয়া দিয়া সে পা টিপিয়া পিছন হইতে রঙের বাক্সটা আঁচলের তলায় লুকাইয়া নিতান্ত ভালমানুষের মত ডালের দিকে নজর দেয়। হরিচরণ রঙ না পাইয়া বিরক্ত হয়। বলে, "দেখ তো, যত নষ্টামী, কাজের সময়। রঙ কোথায় রাখলে?"

"বা রে, আমি কি জানি, আমি এখান থেকে উঠলাম কখন?" খুব গম্ভীরভাবে বিশে' বলে।

হরিচরণ উঠিয়া বিশে'কে টানিয়া তোলে। কোঁচড় হইতে রঙের বাক্স গড়াইয়া পড়ে। হরিচরণ তার টুকটুকে গাল দু'টি টিপিয়া বলে, "তবে রে চোর!"

রান্না সারিয়া বিশে' আসিয়া হরিচরণের পিছনে বসে। অনেকক্ষণ মুগ্ধ-নয়নে চাহিয়া থাকে। তার পর রঙের উপর তুলি বুলাইয়া এক রঙের সঙ্গে আর এক রঙ মিশাইয়া একটা যাচ্ছেতাই কাণ্ড করিয়া ফেলে। তবু হরিচরণের ধ্যানভঙ্গ হয় না। তখন বিশে' ছোঁ মারিয়া তুলিটি কাড়িয়া লইয়া ঘরের অপর কোণে লুকায়।

অনেকক্ষণ ধ্বস্তাধ্বস্তির পর হরিচরণ তুলিটি উদ্ধার করে। তখন বিশে' আসিয়া পটখানা উল্টাইয়া রাখিয়া বলে, "এখন ভালমানুষের মত নাইতে যাবে না কি যাও। যে রাজভোগ খাবে তা' আর ঠাণ্ডা করে' কাজ নেই।"

হরিচরণ স্নান করিতে যায়।

এমনি করিয়া হাসি-খেলার ভিতর দিয়া তাদের দিনরাতগুলি কেমন করিয়া কাটিয়া যায়, তাহা তারা টেরই পায় না।

মাসিকপত্রে একখানা ছবি বেচিয়া পাঁচ টাকা পাইয়া হরিচরণ চট্ করিয়া হিসাব করিয়াছিল যে, মাসে এমন বিশখানা ছবি সে আঁকিতে পারে। সুতরাং মাসে একশো টাকা তার নেয় কে? সেই ভরসায় ছাতি ফুলাইয়া সে বউ আনিতে গিয়াছিল, খুব তেজ দেখাইয়াই তাকে লইয়া আসিয়াছিল।

কিন্তু এই যে একখানা ছবি বেচিয়াছিল, তার পর কম হইলেও একশোখানা ছবি আঁকিয়া সে দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেচিতে পারে নাই। কেবল খান দুই ছবি এ পর্য্যন্ত তিন টাকা দরে বিক্রী হইয়াছিল।

কাজেই হরিচরণ অন্ধকার দেখিল। কিন্তু সে অল্পক্ষণ। ছাতি ফুলাইয়া সে বলিল, "ঐসা দিন নহী রহেগা। আজ দেশের লোক আমাকে আদর করছে না, একদিন তাদের চিনতে হবে, আদর ক'রতে হবে। একদিন আমার ছবির জন্য কাড়াকাড়ি লেগে যাবে।"

বিশে' দেশের লোকের উপর বড্ড চটিয়া গিয়াছিল। তাদের কি চোখ নাই?—এমন সুন্দর সুন্দর ছবি তারা নেয় না? এ তাদের নিছক শয়তানী ছাড়া আর কিছুই নয়।

ধারে কিছু দিন চলিল। দুইমাস ঘরের ভাড়া বাকী পড়িতে বাড়ীওয়ালা কিছু কড়া তাগাদা করিলেন, এমন কথাও বলিয়া গেলেন যে, ভাড়া না দিলে ঘর ছাড়িতে হইবে।

বাড়ীওয়ালা চলিয়া গেলে বিশে' মুখ চুণ করিয়া স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া তার পাশে বসিয়া রহিল। তার বুকভরা সহানুভূতি, নীরব দৃষ্টি দিয়া তার স্বামীর অন্তরের ভিতর ঢালিয়া দিল।

অনেকক্ষণ ভাবিয়া বিশে' বলিল "কি উপায় হবে?"

অনেকক্ষণ অপমানে, লজ্জায় মুখ নীচু করিয়া হরিচরণ বসিয়া ছিল। বিশে'র কথা শুনিয়া মাথা নাড়া দিয়া উঠিয়া সে বলিল, "কি আবার হবে। ভয় পাসনে বিশে', আর কটা দিন, সব বেটার মুখনাড়া একবার দেখে নেবো।"

বিশে' ম্লানমুখে বলিল, "কিন্তু—আজ—আজ চাল যে বাড়ন্ত!"

"কেন মুদী"—

"সে ব'লেছে আর ধার দেবে না।" বিশে'র চক্ষু ছল ছল করিতে লাগিল।

হরিচরণ বিশে'কে বুকের ভিতর জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "কোনও ভাবনা করিসনে ছোট-বউ, এমন দিন থাকবে না।"

বিশে' স্বামীর বুকের ভিতর লতাইয়া রহিল, তার চক্ষের জল বাধা মানিল না।

অনেকক্ষণ তাকে আদর করিয়া হরিচরণ তাকে শান্ত করিল। তার চোখ দুইটা পড়িয়া রহিল বিশে'র হাতের তাবিজের উপর—কিন্তু যে কথা তার মনে হইল সে কথা মুখ ফুটিয়া বলিবার কথায় তার বুক ফাটিতে লাগিল।

হরিচরণ বলিল, "একটা কথা বলবো ছোট-বউ, তোর মনে দুঃখ হবে না তো?"

"কি কথা?"

"আমাকে তোর এই তাবিজ জোড়া ধার দিবি?"

গদাই পালের নাতিবউ সে—তার গা ভরা গয়না। গদাই পাল নিজে এ গয়নার বেশীর ভাগ গড়াইয়া রাখিয়াছিল হরিচরণের জন্মের কয়েকদিন

পর। সেই অবধি সেগুলি তোলা ছিল। ছোট-বউ আসিয়া সে গয়না পাইয়াছিল। তা ছাড়া তার বাপও দু'খানা গয়না দিয়াছিল। কাজেই তার গা-ভরা সোনার গয়না।

গয়না দেওয়ার কথা শুনিয়া বিশে'র বুকের ভিতর ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল—তার এত আদরের গয়না! সে ফস্ করিয়া বলিয়া বসিল, "ওমা সে কি! গয়না বেচবে না কি? সে আমি দেব না।"

হরিচরণের বুকে কথা কয়টা ছুরীর মত গিয়া বিঁধিল। সে মুখ ফিরাইয়া বলিল, "না, থাক; চাইনে। তার বুক ভাঙ্গিয়া কান্না পাইল—দেশের লোক তো তাকেই চিনিলই না, তার সহধর্ম্মিণী চিরসঙ্গিনী আদরিণী পত্নীও তাকে একখানা গয়না দিয়া বিশ্বাস করে না। গয়নাই কি এত বড়? আর তার এত কষ্ট, কিছুই না। তা ছাড়া গয়না তো একেবারে লইবে না—ধার শুধু—তার পয়সা হইলেই ফিরাইয়া দিবে—এইটুকু বিশ্বাস নাই তার।

নীরবে উঠিয়া হরিচরণ তার রং তুলি লইয়া বসিল ছবি আঁকিতে। একখানা ছবি আঁকা প্রায় শেষ হইয়াছিল, তার উপর দুই চারবার তুলি বুলাইয়া শেষ করিয়া যত্নের সহিত সে তাহাকে কাগজে জড়াইয়া বাঁধিল—তার পর জামা পরিতে লাগিল।

কথাটা বলিয়াই বিশে'র মনে হইয়াছিল যে কথাটা ভাল হয় নাই। স্বামীর মুখের চেহারা ও রকম-সকম দেখিয়া সে ভয়ও পাইল, কষ্টও পাইল। কিন্তু মুখ ফুটিয়া আর কোনও কথা বলিতে তার সাহস হইল না। সে মুখ ফিরাইয়া ঘর গুছাইতে লাগিল, আর মাঝে মাঝে অতি সঙ্গোপনে আঁচল তুলিয়া চক্ষু মুছিতে লাগিল।

জামা ও চাদর লইয়া হরিচরণ বাহির হয় দেখিয়া সে গোপনে তাবিজ দু'গাছা খুলিয়া হাতে করিল। তার পর সে জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় যাচ্ছ?"

"যাই দেখি 'উদাসী' আফিসে—এ ছবিখানা বেচে কিছু পাই কি না?"

"ওমা, এত বেলায় সেখানে কোথায় যাবে? কখন বা ফিরবে, কখন বা খাবে?"

শুষ্ক হাসি হাসিয়া হরিচরণ বলিল, "খাব আর কি ছোট-বউ? ছবি বেচলেই না খাওয়া!"

মাথা নীচু করিয়া হরিচরণের হাত ধরিয়া বিশে তাবিজ রাখিয়া বলিল, "ও থাক, এখন এইটে বেচে কিছু কিনে নিয়ে এসো।"

হরিচরণ বলিল, "না থাক, এ ছবি তারা নেবে, এতেই চ'লে যাবে।"

ধপ করিয়া হরিচরণের পায়ের উপর পড়িয়া বিশে' বলিল, "রাগ ক'রো না আমার উপর, আমার বড় ঘাট হ'য়ে গেছে। পায় পড়ি, এটা নিয়ে যাও।"

হরিচরণ চুপ করিয়া রহিল। মাথা নীচু করিয়া বিশে' তার পা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল।

শেষে হরিচরণ তাকে বুকে টানিয়া লইয়া চুম্বন করিল, দু'জনের অশ্রু মিলিয়া গেল।

দুইদিন পর হরিচরণ পাঁচ টাকায় একখানা ছবি বেচিল। ফিরিবার পথে সে এক টাকার ফুলের গহনা কিনিয়া আনিল, বিশে'কে সাজাইবে বলিয়া।

বাড়ী ফিরিয়া হাসিমুখে সে বিশে'কে বলিল, "মার দিয়া কেল্লা ছোট-বউ, ছবি নিয়েছে—পাঁচ টাকা। তা ছাড়া দু'খানা ছবির অর্ডার দিয়েছে!"

আনন্দে অধীর বিশের মুখখানা হাসিতে ভরিয়া গেল। সে হাত পাতিয়া বলিল, "কই, দেখি টাকা!"

হরি পকেট হইতে চার টাকা ঝনাৎ করিয়া তার হাতে ফেলিয়া দিল।

বিশে বলিল, "আর এক টাকা?'

হাসিয়া হরিচরণ বলিল, "খরচ ক'রেছি,—এই মদ খেয়েছি।"

"ঈস্" বলিয়া বিশে কৌতুকভরা ভ্রূকুটি করিল, কিন্তু তার বুকের ভিতর একটু কাঁপিয়া উঠিল—একবার মনে হইল সত্য নয় তো?

"না ছোট-বউ, মদ খাইনি, তবু অমনি নেশার ঝোঁকে খরচ ক'রেছি, তোর জন্যে।"

"আমার জন্যে? কি এনেছ দেখি?"

কাপড়ের তলা হইতে কলাপাতার মোড়ক বাহির করিয়া হাসিমুখে হরিচরণ গহনাগুলি বিশে'র সামনে ধরিল।

বিশের মনটা প্রসন্ন হইল, কিন্তু সে টাকার কদর বুঝিয়াছে, তাই অমনি বলিয়া ফেলিল, "ছি, এতগুলো পয়সার শুধু ফুল কিনে ফেললে! তোমার যদি একটু পয়সার দরদ থাকে!"

হরিচরণ এ কথায় বড় আঘাত পাইল। সে সারা পথ মনে মনে কত কল্পনা করিতে করিতে আসিয়াছিল, ফুলের গয়না পাইয়া বিশে' না জানি কত খুসী হইবে—গয়না পরিলে তাকে কি সুন্দর দেখাইবে—কত আদর সে করিবে। আর বিশে কি না বলিল এই কথা!

ফুলগুলি সুদ্ধ কলাপাতটা ধপ করিয়া মাটিতে ফেলিয়া দিয়া সে নীরবে জামা খুলিতে লাগিল। স্বামীর ভাবান্তর বিশে'র চক্ষু এড়াইল না। সে বুঝিল তার স্বামীর এত আদরের উপহার পাইয়া তার খরচের কথাটা তোলা অন্যায় হইয়াছে। কিন্তু কোনও কথা বলিতে তার সঙ্কোচ বোধ হইল।

সে নীরবে ফুলগুলি শুঁকিল, অতি সঙ্গোপনে সে গুলিকে চুম্বন করিল। তার পর সেগুলি তাকের উপর তুলিয়া রাখিয়া স্বামীর হাতে গামছা তুলিয়া দিল। হরিচরণ স্নান করিতে গেল। রোজ সন্ধ্যাবেলায় সে স্নান করিত।

সেই অবসরে বিশে' তার সোনার গয়না খুলিয়া আদ্যোপান্ত ফুলের গহনাগুলি পরিল। একটা মালা সে শুধু রাখিয়া দিল।

হরিচরণ স্নান করিয়া ফিরিয়া আসিয়া তার পুষ্পময়ী মূর্ত্তি দেখিয়া মুগ্ধ হইল। বিশে' মাথা নীচু করিয়া লজ্জিত-শঙ্কিত দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে চাহিয়া মৃদু হাসিতেছিল। হরিচরণের মুখের উপর হইতে মেঘের পরদা সরিয়া গেল দেখিয়া ভরসা করিয়া সে মালাটা হরিচরণকে পরাইয়া দিয়া গড় হইয়া তাকে প্রণাম করিল। হরিচরণ তাকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া চুম্বন করিল।

তার পর বিশে' নিজে স্বামীর চুল আঁচড়াইয়া দিল। একখানা কম্বলের আসন পাতিয়া ঠাঁই করিয়া তার সামনে ভাত বাড়িয়া দিল।

আর একদিন বিশে আবদার ধরিল, সে গঙ্গা নাইতে যাইবে। হরিচরণ মানা করিল।

বিশে' অভিমান করিয়া শুইয়া পড়িল।

হরিচরণ তখন বলিল, "আচ্ছা, চল যাচ্ছি।"

বিশে বলিল, "না, থাক।"

হরিচরণ বলিল, "ঘাট হ'য়েছে ছোট-বউ, চল্।"

"না না, আমি যাব না।"

"না, যাবি, বলিয়া হরিচরণ তাকে টানিয়া তুলিয়া বুকে জড়াইয়া ধরিল, বিশে' চক্ষু বুজিয়া রহিল।

হরিচরণ তার মুখে চুমো দিতে গেল, বিশে মুখ ঘুরাইয়া লইল।

অনেকক্ষণ হরিচরণ সাধ্য-সাধনা করিল, আদরে সোহাগে বিশেকে ভরিয়া দিল, কিন্তু বিশে'র ঐ এক কথা—"না, যাবো না।"

হরিচরণ তাকে ছাড়িয়া দিল, বিশে শুইয়া পড়িল।

হরিচরণ মুখ ভার করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল—তখনও তার স্নান আহার হয় নাই।

শঙ্কিত হইয়া বিশে' মুখ তুলিয়া চাহিল। তার পর উঠিয়া বসিল। তার পর দ্বারের কাছে গিয়া মুখ বাড়াইয়া দেখিল।

হরিচরণ রাস্তায় বাহির হইয়া গেল, বিশে' গালে হাত দিয়া ভাবিতে লাগিল।

আবার মুখ বাড়াইয়া দেখিল, হরিচরণ ফিরিতেছে। সে তাড়াতাড়ি গামছা ও তেল আনিয়া কলতলায় রাখিল। হরিচরণ আসিয়া স্নান আরম্ভ করিল।

বিশে' ত্রস্তেব্যস্তে ভাত বাড়িতে লাগিল। হরিচরণ ঘরে ফিরিয়া দেখিল, অন্ন প্রস্তুত। সে খাইতে বসিল।

এক গ্রাস মুখে দিয়া হরিচরণ বলিল, "মিথ্যে আমার উপর রাগ করলি ছোট-বউ, আমি কি-ই বা ব'লেছিলাম।"

মুখ নীচু করিয়া বিশে' বলিল, "থাক সে কথায় আর কাজ নেই।"

কিন্তু হরিচরণ কথা তুলিল। শেষে স্থির হইল, পরের দিন ভোরে গিয়া তারা স্নান করিয়া আসিবে।

মাস কয়েক পর এক দিন একসঙ্গে দশটা টাকা পাইয়া স্বামী-স্ত্রীর আর আনন্দ ধরে না।

খাওয়া দাওয়ার পর তারা বসিয়া আছে, এমন সময় অসীম আসিয়া উপস্থিত হইল। তার সদা প্রসন্ন মুখখানা শুকনো হইয়া গিয়াছে।

অসীম বলিল, "ভায়া, এইবার বিদায় হ'লাম। ক'লকাতা আমার সইলো না। গিরিমাটি কিনেছি—চিমটেও একটা যোগাড় ক'রেছি, এইবার ভেসে পড়বো।"

হরিচরণ বলিল, "শুনেছি ও ব্যবসাটা বেশ লাভজনক।"

"ওরে ভাই, লাভের ব্যবসা অনেক আছে -অনেকগুলো ক'রেওছি। আমার এই যে বই লেখা ব্যবসা, এতে বঙ্কিমবাবু শরৎ চাটুজ্জে বড়লোক হ'য়ে গেছে! —কিন্তু অভাগার সব সমান—

সাগর সেচিনু যতন করিনু
রতন লভিবার আশে,
সাগর শুকালো রতন লুকাল
অভাগীর করম দোষে।"

অসীম সুরসিক, সুকণ্ঠ—তার কথার ভিতর এমন গানের বুকনি প্রায় থাকে। এমন সুললিত কণ্ঠে তান লয় সহকারে অসীম গানটির এই পদ গাহিয়া গেল যে, বিশে অবাক্ হইয়া তার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তার ইচ্ছা হইল আর একটু শোনে—কিন্তু সে তো অসীমের সঙ্গে কথা কয় না।

অসীম বলিল, "কিছু মনে করো না বউমা, আমার কথার মাঝে মাঝে এক একটা গান ছিটকে ওঠে—সহজ মানুষের হেঁচকীর মত।"

হরিচরণ ম্লান মুখে বলিল, "কেন, তুমি তো সেদিন দু'শো টাকা পেলে একখানা বই লিখে। তোমার মন্দ চলছে কি?"

"ওরে ভায়া, সে কি দু'শো' টাকা—সে একটা মায়া। আত্মারাম সরকারের একটা ভেল্কি। বইওয়ালার দোকান থেকে নিয়ে এলাম কর্‌করে বিশখানা নোট, কি আনন্দ—দু'শো' টাকার মালিক আমি! মেসে ফিরে দেখি, খবর বোধ হয় বেতারে পৌঁছে গেছে; বাড়ীর ফটক থেকে ঘরের দোর পর্য্যন্ত সার বেঁধে তারা ব'সে আছে।"

"কারা?"

"আমার সাত জন্মের কুটুম্বেরা। একজনের কাছে দরকার মত কয়েকটা টাকা নিয়েছিলাম, শালা হাণ্ডনোট লিখিয়ে নিয়েছিল। তাতেও খুসী নয়,

আবার টাকা চায়। মেসের ম্যানেজার হেঁড়ে গলায় হাঁকছে 'তিন মাসের টাকা বাকী প'ড়েছে অসীমবাবু—এমন ক'রে চলবে না। এক বেটা খবরের কাগজ দেয়, সে বলে, তারও না কি দু'মাসের পাওনা। এমনি সব। আমি খোস মেজাজে ছিলাম, চট্‌পট্ বেটাদের মুখের উপর সব নোট ছুঁড়ে মারতে লাগলাম। ঘরে গিয়ে দেখি, পকেটে আর একখানি মাত্র অবশিষ্ট আছে—Solitary Reaper !

Behold her single in the field

* * * *

Yon solitary highlard lass—
Alone she cuts and binds the grain
And sings a melancholy strain.

ভারী চটে গেলাম। এমনি গলদঘর্ম্ম হ'য়ে বইখানা লিখলাম—সে কি হতচ্ছাড়াদের জন্যে। নোটখানা আর পকেটে তুললাম না—এক বোতল জনি ওয়াকার আনালাম। দু'শো টাকা! ওরে ভায়া, আমরা হচ্ছি লক্ষ্মীছাড়ার খাস পল্টন, আমাদের স্পর্শে—

মহাসিন্ধু মরুভূমি হয়
হিমালয় যায় যমালয়—

"দু'শো' টাকা তো কোন্ ছার!"

"তাই বুঝি হাল ছেড়ে বিবাগী হ'চ্ছ! ভীরু!"

"ভীরু! আমি ভীরু? ভাগ্যদেবীর ভ্রূকুটিকে আমি ভয় করি না ভায়া, ওর সঙ্গে অনেক দিন ঘর-বসত ক'রছি। কিন্তু—উপস্থিত ওইটাই হ'চ্ছে একমাত্র পথ।"

"কেন? কি হ'য়েছে? কিসের জন্য বিবাগী হবার খেয়াল হ'য়েছে।"

"পাঁচ টাকার জন্য। পাঁচ টাকার এক কাবুলীওয়ালা পাওনাদার দেখলুম আমার দোর গোড়ায় তার মোটা লাঠিখানা নিয়ে ব'সে আছে, আর আমাকে নানারকম প্রিয় সম্ভাষণ ক'রছে। বাড়ী ফিরবার উপায় নেই—তাই পথে বেরুচ্ছি।"

"ওঃ, এই কথা, মাত্র পাঁচ টাকার জন্যে এতখানি!

"মাত্র পাঁচ টাকা! পাঁচ টাকা একটা 'মাত্র' হ'ল। ভায়া, আমার সন্দেহ হয় তুমি কিঞ্চিৎ বড়লোক হ'য়েছ, ওই কথাটার ভিতর একটু টাকার গন্ধ পাচ্ছি। 'মাত্র' পাঁচ টাকা—ছাড়তে পারবে?"

সামান্য একটু ইতস্ততঃ করিয়া হরিচরণ বিশে'কে বলিল, পাঁচ টাকা বের ক'রে দাও ছোট-বউ।"

"Bravo! বেঁচে থাক ভাই আমার—বউমা, কিছু মনে ক'রবেন না—এক গুণে দিলে লক্ষ গুণে পাবে মা—জয় শ্রীরামে!"

বউমা কিন্তু ইতস্ততঃ করিতেছিল। সে একবার স্বামীর দিকে ভ্রূকুটি করিয়া চাহিল—মাত্র দশটি টাকা, তার ভিতর হইতে পাঁচ টাকা বাহির করিয়া দিতে তার হাত সরিল না।

হরিচরণ তার মনের ভাবটা আঁচ করিয়া নিজে উঠিয়া বাক্স হইতে পাঁচ টাকা বাহির করিয়া দিল। ছোট-বৌ মুখ ভার করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

অসীম তার পিছু পিছু বলিল, "কিছু মনে ক'রো না বউমা—টাকা জিনিসটা ঐ রকমই, থাকবার জন্যে আসে না।"

অসীম চলিয়া গেলে বিশে' আসিয়া বলিল, "দশটি টাকা তো এতদিন বাদে পেয়েছিলে, তার থেকে পাঁচ টাকা ওকে দিলে কি ব'লে?"

হরিচরণ একটু চটিয়া বলিল, "আমার খুসী আমি দি...।"

বিশে মুখ গম্ভীর করিয়া একটা ঝটকা মারিয়া উঠিয়া বলিল, "তবে আর ও ছাই-পাঁশ আমার হাতে দিও না, আমি তোমার টাকা ছোঁব না।"

"ছুঁয়ো না, বয়ে গেল।"

"তা যাবে কেন? আমার কিসে বা তোমার বয়ে যায়। বয়ে' যায় যত বদমাইস মাতালদের নেকী কান্নায়।"

"দেখ ছোট-বউ, মুখ সামলে কথা ক'স। ওকে একটা 'মা' তা ঠাউরেছিস। ওর মত লেখক বাঙ্গালা দেশে দু'টো নেই। অভাগা দেশ চিনলে না তাই, নইলে ওর আজ হওয়া উচিত ছিল লক্ষপতি—সোনার সিংহাসনে বসিয়ে ওকে লোকের পূজা করা উচিত।"

"তাই কর গে তুমি পূজা।" বলিয়া গম্ভীর হইয়া বিশে গৃহকর্ম্মে নিযুক্ত হইল।

হরিচরণও রাগে গুম হইয়া বসিয়া রহিল। তার মনে হইল কি ছোট নজর বউটার, পাঁচটা টাকার এত মায়া!

খাওয়া-দাওয়ার পর হরিচরণের রাগ পড়িয়া গেল, সে বিশেকে কোলের কাছে টানিয়া বসাইতে গেল, সে ছিটকাইয়া দূরে গেল। হরিচরণ তাকে আদর করিয়া আবার টানিয়া আনিল।

হরিচরণ বলিল, "শোন ছোট-বউ, একটা গল্প বলি। একটা ফকীর ছিল, সে কোনও দিন আধ-পেটার বেশী খেতে পেতো না। হাজার ঘুরে ভিক্ষে করুক, সেই আধ পেটা। ক্ষিধে তার মেটে না। একদিন সে কেঁদে ভগবানকে বল্লে, 'ভগবান, একটা দিন শুধু পেট ভরে' খেতে দাও—সারা জন্মে আমার জন্য যা মাপিয়েছ তাই না হয় এক সঙ্গে একদিন দেও, আমি একবার প্রাণ ভরে' খেয়ে নি—তার পর আর খাব না।' ভগবান্ বল্লেন, 'আচ্ছা'। সেইদিন ফকীর অনেকগুলো টাকা পেলে—তার সারা জীবনের আধ পেটা খাওয়ার বরাদ্দ! খুসী হ'য়ে ফকীর বাজার থেকে অনেক খাবার নিয়ে এলো, রাজ্যি সুদ্ধ লোক নেমন্তন্ন ক'রে এনে খুব হৈ চৈ ক'রে পেট ভরে' খেলে। তার পর বল্লে—ব্যস্ আর আমার দুঃখ নেই ভগবান, একদিন পেট ভরে খেতে পেয়েছি।' পরের দিন কিন্তু সে অভ্যাস মত ভিক্ষেয় বেরোলো—মনে মনে ভাবলে, আজ আর কিছু পাব না—জীবনের বরাদ্দ তো খেয়ে নিয়েছি। কিন্তু অবাক হ'য়ে গেল সে যে সেদিনও সে ভিক্ষে পেল, অন্য দিনের চেয়ে বেশী। সেদিন সে ভগবানকে বল্লে, 'মিথ্যাবাদী তুমি ভগবান। আমায় না তুমি সারা জীবনের বরাদ্দ একদিনে দিয়েছিলে?' ভগবান বল্লেন, সে তো দিয়েছিলাম বাপু—কিন্তু তুমি তো একা খাওনি, আমাকে যে খাইয়েছ। সে খাওয়ার দেনা তো শোধ ক'রতে হবে—আমি তো তোমার কাছে দেনদার থাকতে পারি নে।" ফকীর অবাক্ হ'য়ে ব'ল্লে 'তোমাকে খাইয়েছি! কবে প্রভু?' 'কেন সেদিন সে রাজ্যি শুদ্ধ লোক ডেকে খাওয়ালে, সে কাকে দিয়েছ? আমি ছাড়া দুনিয়ায় কেউ আছে কি?' ফকীর তখন মাথা নীচু ক'রে কেঁদে ব'ল্লে, 'ভগবান, তাই তো লোকে তোমায় বলে দয়াময়।"

গল্পটি শুনিয়া বিশের চক্ষু আনন্দাশ্রুতে ভরিয়া উঠিল। হরিচরণ বলিল,

"পাঁচটা টাকার জন্য দুঃখ ক'রছিস ছোট-বউ—ও ভগবানকে ধার দিয়েছি। এ দেনদার ঠকাবে না।"

বিশে চক্ষু মুছিল ; কিছু বলিতে পারিল না।

হরিচরণ বলিল, "ভেবে দেখ ছোট-বউ, অমন অবস্থা আমার কতদিন হয়—তাতে কি দুঃখ পাই! অসীমের আজকের কষ্ট যদি আমরা না বুঝবো তো কে বুঝবে বল!"

স্বামীর কথায় বিশের মনের গ্লানি ধুইয়া গেল, গর্ব্বে বুক ফুলিয়া উঠিল—এমন দেবতা স্বামী তার। সে চট্‌ করিয়া স্বামীর পায়ের ধুলো লইয়া বলিল, "আমায় মাপ কর। মেয়েমানুষ আমি—ও-সব বড় কথার আমি কি-ই বা বুঝি!"

তারপর আবার তাদের ঘরে আনন্দের ফোয়ারা ছুটিল।

৬

এমনি করিয়া দিন চলিতে লাগিল। হরিচরণের ছবি রাশি রাশি ঘরে মজুত হইতে লাগিল। তার খরিদ্দার জোটে না। মাঝে মাঝে যখন সে প্রায় হতাশ হইয়া ওঠে, তখন হঠাৎ একদিন হয় তো পাঁচ টাকা কি সাত টাকায় একখানা ছবি বেচিয়া সে আবার আশায় উৎফুল্ল হইয়া ওঠে—স্থির করে, এইবার তার দুঃখের দিন কাটিয়াছে, এইবার তার ছবি কাটিবে। কিন্তু তার পর আবার দিনের পর দিন যায়, ছবির পর ছবি ঘুরিয়া আসে।

একদিন হরিচরণ তার সব ছবি বাঁধিয়া বাহির হইয়া গেল। রাস্তার ধারে একটা ফাঁকা জায়গায় সে ছবিগুলি সাজাইয়া বসিল—চার পয়সা হইতে চার আনায় এক একখানা ছবি বেচিয়া সে অনেকগুলি ছবি কাটাইল। বাড়ী ফিরিবার সময় পয়সা গুণিয়া দেখিল তিন টাকা হইয়াছে। মনটা ভার হইয়া গেল।

বাড়ী ফিরিয়া হাত পা ছড়াইয়া ভাবিতে লাগিল।

খানিকটা কাদা-মাটি লইয়া বিশে উনান গড়িতেছিল—হরিচরণের একটা খেয়াল হইল। সে সেই মাটি লইয়া পুতুল গড়িতে বসিয়া গেল। চৈত্র-সংক্রান্তির দিন পদ্মপুকুর মেলায় সে গোটা কয়েক কৃষ্ণনগরী পুতুল বেচিয়া পাঁচ টাকা পাইল। এমনি করিয়া টায়-টোয় তার দিন চলিতে লাগিল।

ক্রমে এক এক করিয়া বিশে'র গয়না নিঃশেস হইয়া গেল। তার হাতে রহিল শুধু এক জোড়া বালা।

হরিচরণের বরাবরই মনে মনে আশা ছিল একটা বড় কিছু করিবে—এমন একখানা ছবি আঁকিবে যাহাতে সুরেনের মত তার নামে টী টী পড়িয়া যাইবে—তার পর আর তাঁকে পায় কে? কিন্তু সে অবসর সে পায় না। রোজ রোজ অভাবের তাড়ায় সে চুটকী ছবি আঁকে, কি সাইন-বোর্ড লিখে—দিনের অন্ন রোজগারের আশায়। বড কাজে হাত দিবার সময় সে পায় না।

শেষে মরিয়া হইয়া একদিন যথাসর্ব্বস্ব খরচ করিয়া সে একখানা বড় ক্যানভাস ফ্রেমে আঁটিয়া লইয়া আসিল। তার উপর শাদা প্রলেপ দিয়া তাকে দশ দিন ফেলিয়া রাখিতে হইল। তার পর সে দিনের পর দিন, কোনও দিন এক পোঁচড়, কোনও দিন দুই পোঁচড় রং লাগাইতে লাগিল। অনেক সময় লাগে তাতে। অনেকক্ষণ ক্যানভাসখানির দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া চাহিয়া সে হয় তো ঠিক রেখাটির সন্ধান পায়, আর তুলির লেখায় তাকে ফুটাইয়া তোলে—আবার ভুল হয় আর সংশোধন করে। এমনি করিয়া ধীরে ধীরে তার ছবি অগ্রসর হইতে লাগিল।

তার পর আর একটা খেয়াল হইল তার, একটা প্রতিমূর্ত্তি গড়িবে—বিশে'র। একটা বৃহৎ মূর্ত্তি ফাঁদিয়া মাটির—তাল লইয়া সে বসিল, বিশে' তার সামনে বসিয়া রহিল।

সে কাজও অত্যন্ত ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল। সাইন-বোর্ডের তাগাদায় মূর্ত্তি ও ছবি ছাড়িয়া তাকে কাজ করিতে হইত।

এমনি করিয়া দিন চলিতে লাগিল।

বিশে'র প্রতিমূর্ত্তিখানি শেষ হইল, বিশে'র একখানা শাড়ী তাকে পরান হইল।—বিশে' দেখিয়া অবাক, মুগ্ধ হইয়া গেল। হরিচরণ মুগ্ধ দৃষ্টিতে তার দিকে চাহিয়া রহিল, আর পরম সমাদরে তার শেষ আঁচড়গুলি লাগাইতে লাগিল। কাজ শেষ করিয়া সে আনন্দের অ· ৎশয্যে বিশেকে জড়াইয়া ধরিয়া চুম্বন করিল।

বাহিরে রমেশের সাড়া পাওয়া গেল। হরিচরণ তাড়াতাড়ি বিশে'কে ঘরের বাহিরে পাঠাইয়া দিল, মূর্ত্তিটার মাথার কাপড় একটু টানিয়া দিল। তার পর রমেশ আসিল।

হরিচরণ বলিল, "এসো ভাই, ব'সো, আমি একটু মুখ-হাত ধুয়ে আসি—ততক্ষণ তুমি ছোট-বউর সঙ্গে কথা কও," বলিয়া মূর্ত্তিটিকে দেখাইয়া দিয়া বাহিরে দরজার আড়ালে দাঁড়াইল। বিশে'ও তখন সেখান হইতে উঁকি মারিতেছিল।

রমেশ মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া খানিকক্ষণ অনর্গল কথা বলিয়া গেল। শেষে বলিল, "বা রে, আমি কেবলই ব'কেই যাচ্ছি আর তুমি বোবা হ'য়ে ব'সে রয়েছ—ব্যাপারখানা কি ?"

মূর্ত্তির মুখে বিশের চাপা দুষ্ট হাসি আঁকা হইয়াছিল, তাই দেখিয়া রমেশ বলিল, "বুঝেছি, একটা মতলব আছে কিছু,—কোনও রসিকতা হ'চ্ছে। কি ব্যাপারখানা বলই না ছাই বউদি"—

হো, হো, খিল খিল করিয়া হাসিয়া হরিচরণ ও বিশে' ঘরে প্রবেশ করিল।

বিশে বলিল, "কেমন জব্দ ঠাকুরপো!"

অবাক হইয়া রমেশ একবার বিশে ও একবার তার প্রতিমূর্ত্তির দিকে চাহিল। আনন্দে তার মুখ ভরিয়া উঠিল।

"বলিহারি ভাই, কি মূর্ত্তিই বানিয়েছ—চেনে কার সাধ্য? এটা বেচলে দু'শো টাকা বে-ওজর পাবে।"

ঘাড় নাড়িয়া হরিচরণ বলিল, "বেচবার জন্যে তো গড়ি নি এটা।"

"বেচবে না, বল কি? আমার কথা শোন—এইটাকে একজিবিশনে পাঠিয়ে দেও—পাঁচশো টাকা এর দাম না হ'য়ে যায় না।"

হাসিয়া হরিচরণ বলিল, "তার চেয়ে বরং ছোট-বউকে বেচে দি, অন্ততঃ হাজার খানেক টাকা আসবে।"

বিশে বলিল, "আ মরণ! ঢংয়ের কথা শোন।"

হরি। "কেন তাতেই বা অন্যায় কি—তোমার চেয়ে ও মূর্ত্তির উপর আমার দরদ বেশী, তুমি যতই যা হও, আমার হাতে গড়া তো নও।"

একটা ভ্রূকুটি করিয়া মনোরম ভঙ্গীতে বিশে মুখ ফিরাইল।

রমেশ ও হরিচরণ হাসিয়া উঠিল।

আবার মুখ ফিরাইয়া বিশে' বলিল, "আহা, কি রসিকতাই হ'ল!"

রমেশ। আরে চট কেন বউদি, মুখে ব'ল্লে বলেই তো হরিদা' তোমায় সত্যি সত্যি বেচে ফেলছে না।

"থাম, ও কথা আর মুখে এনো না বলছি—নইলে দেখাব মজা।"

পরে রমেশ বলিল, "হরিদা' তোমার ছবি টবি কি আছে দেও দিকিনি খানকয়েক—একজনকে দেখিয়ে আনি।"

"কেন? কাকে দেখাবে?"

"মহারাজা প্রমোদনারায়ণকে।"—

"মহারাজা প্রমোদনারায়ণ, তার সঙ্গে আবার তোমার কবে আলাপ হ'ল?"

গোঁফে চাড়া দিয়া রমেশ বলিল, "বোঝ, এখন আর আমি বড় কেও কেটা নই—মহারাজার প্রাইভেট সেক্রেটারী।"

"তাই না কি? কবে থেকে?

"তিন দিন। সেদিন মহারাজা মাঠে খেলা দেখতে গিয়েছিলেন; আমার খেলা দেখে মুগ্ধ হ'য়ে গেলেন। অমনি চাকরী—তার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সঙ্গে খেলবার নেমন্তন্ন!

তার পিঠে একটা প্রচণ্ড চাপড় মারিয়া হরিচরণ বলিল, "বলিহারি! তবে আর আমাদের পায় কে? তা' কবে খাওয়াচ্ছ শুনি?"

"এক্ষুনি, কিন্তু টাকাটা ধার দিতে হ'বে—আমার ট্যাঁক ফরসা।"

"তা হ'লে খেতে দেরী আছে। আমার ঘরে লক্ষ্মীর কোনও ধরাবাঁধা আস্তানা নেই জান তো।"

"দেখলে বউদি, রাস্কেল তোমার অপমান ক'রছে। আরে মূর্খ, তোর এমন লক্ষ্মী থাকতে তোর ঘরে লক্ষ্মী নেই।"

মুখখানা একটু ভার করিয়া বিশে' বলিল, "লক্ষ্মী না আর কিছু—আমায় মত পোড়াকপালী আর আছে?"

"শুনলে? এটা তোমার ঠেস দিয়ে বলা হ'ল দাদা! তুমিই ওঁর পোড়াকপাল—বুঝলে।"

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস হরিচরণের হাসির ভিতর দিয়া ভেদ করিয়া উঠিল। কিন্তু রমেশ তাহাকে আমল দিল না। সে বলিল, "নেও, ছবিগুলি বের কর চট্-পট্। মহারাজার ছবির কি বাতিক জান তো? নজরে লাগলে চাই কি বউদির পোড়াকপালও ফিরতে পারে।"

ছবিগুলি নাড়াচাড়া করিতে করিতে হরিচরণ বলিল, "ভাল কিছু নেই—সব জলের দরে বেচে ফেলেছি।" তার পর খুঁজিয়া পাতিয়া চার পাঁচখানা ছোট ওয়াটার্-কলার ছবি বাঁধিয়া রমেশকে দিল।

তিন দিন পর রমেশের সঙ্গে হরিচরণের আবার দেখা। সে কম্পিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "ছবিগুলো দেখিয়েছিলে?"

"হাঁ।"

"কি খবর?"

"খোস খবর হ'লে বাড়ী বয়ে' দিয়ে আসতাম দাদা! খবর ভাল নয়।"

"তবু?"

"বেটা গাড়ল। আর্টের সমজদার ব'লে শালার ভারি জাঁক—আর বেটা বলে কি না—এ যে কালীঘাটের পট।"

হরিচরণের মুখ চুণ হইয়া গেল। মহারাজা প্রমোদনারায়ণ চিত্ররসজ্ঞ এবং স্বয়ং একজন চিত্রকর বলিয়া তার জানা ছিল। তাঁর কাছে পরিচিত হইবার অবসর পাইয়া সে অনেক আশা করিয়াছিল। এ খবর শুনিয়া তাই সে মুশড়াইয়া গেল।

রমেশ বলিল, "Buck up old chap! প্রমোদনারায়ণ ছাড়াও জগতে আর্টের সমঝদার আছে। একদিন তারা তোমায় চিনবে। মুশড়ে যেও না—হিম্মৎ মৎ ছোড়না।"

এ দুঃসংবাদটা হরিচরণ বিশে'র কাছে গোপন করিল। ভাবিল, এ দুঃখটা সে না হয় নাই পাইল।

হরিচরণ তার পর কিছুদিন কেবলি সাইনবোর্ড লিখিল, ছবির ধার দিয়াও গেল না।

৭

একদিন বাহির হইতে ফিরিয়া হরিচরণ দেখিল, বিশে' তার সেই অসমাপ্ত বড় ছবিখানার ঢাকনা খুলিয়া অতৃপ্ত নয়নে চাহিয়া দেখিতেছে।

হরিচরণ দ্বারের কাছে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া কিছুক্ষণ সেদিকে চাহিয়া দেখিল।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িয়া সে বলিল, "কি দেখছো ছোট-বউ?"

বিশে' যেন একটু চমকাইয়া উঠিল। সে বলিল, "দেখছি—কি সুন্দর হ'চ্ছে ছবিখানা! মেয়েটার মুখ যেন কথা কইছে।"

"আমার ছবিকে সুন্দর শুধু তুই-ই দেখিস ছোট-বউ! আর কেউ দেখে না।" বলিয়া হরিচরণ বসিয়া কপালের ঘাম মুছিতে লাগিল।

স্বামীর বুকভরা নিষ্ফলতার ব্যথায় বিশের প্রাণটা কাঁদিয়া উঠিল। সে তার দুঃখ চাপিয়া বলিল, "কিন্তু তুমি এ ছবি শেষ ক'রে দেখ, নিশ্চয় সবাই সুন্দর ব'লবে—তোমার এ ছবির আদর না হ'য়ে যায় না।"

"ঠিক এই কথা প্রত্যেকটা ছবির সম্বন্ধেই ভেবেছি ছোট-বউ—এখন আর মনকে ঠকাতে পারছিনে এ কথায়।"

"কিন্তু এমন ছবি তো তুমি আর আঁক নি। আচ্ছা, তুমি রমেশ ঠাকুরপোকে জিজ্ঞাসা কর না, তিনি কি বলেন।'

"সেও যে তোমারই মত অন্ধ। তার কথার দাম কি? সে তো সেই দিনই"—হরিচরণ থামিয়া গেল। সেদিনকার কথাটা যে বিশের কাছে গোপন আছে।

'আচ্ছা, এই একটিবার আমার কথা শোনই না। আঁক তুমি ছবিখানা, সবাই ভাল না বলে, আমার কাণ কেটে দিও।"

"তোর নাক-কাণের কি কিছু বাকী রেখেছি ছোট-বউ, যে কাণ কাটবো আবার! কি ছিলি তুই, কি হ'য়েছিস! গদাই পালের নাতি-বউ, তার আধ-পেটা বই খাওয়া জোটে না।"

অসীমের সাড়া পাওয়া গেল। সঙ্গে যেন আর কে।

বিশে' সরিয়া দাঁড়াইল। অসীম সঙ্গে করিয়া আনিয়াছে এক বইয়ের দোকানদার। অসীমের একখানা বই ছাপা হইবে, তাতে চারখানা ছবি থাকিবে। চারখানায় চল্লিশ টাকা—দর ঠিক হইয়া গেল।

দোকানদার বাহির হইয়া গেলে হরিচরণ অসীমকে বলিল, "সঙ্গে নগদ কিছু আছে ভাই ?"

অসীম একটা নোটের তাড়া বাহির করিয়া একখানা দশ টাকার নোট বাহির করিয়া দিল।

"তিনশো টাকা পেয়েছি ভাই বইখানায়।"

"তবে তো তোমার জয় জয়কার !"

"না ভাই, পাওনাদারদের দল হাঁ ক'রে ব'সে আছে—সবটাই গিলবে বোধ হ'চ্ছে।"

হরিচরণ চট্ পট্ ছবি আঁকিতে বসিয়া গেল। কাগজের উপর পেনসিলের আঁচড় চড়্ বড় করিয়া পড়িতে লাগিল, ঘস্ ঘস্ করিয়া রবার চলিতে লাগিল। সময়ের জ্ঞান তার চলিয়া গেল।

অনেকক্ষণ পর বিশে' আসিয়া তার পেনসিল রবার সব কাড়িয়া লইল, বলিল, "নাও গে যাও।"

"এইটা সেরে যাই লক্ষীটি," বলিয়া হরিচরণ পেনসিলের জন্য আবেদন করিল।

"আর সারতে হ'বে না। খেয়ে দেয়ে ঠাণ্ডা হ'য়ে সেরো।"

অগত্যা হরিচরণ উঠিল। তেল মাখিতে মাখিতে সে বলিল, "তোর কথাই ঠিক ছোট-বউ। ওই ছবিখানা ঠিক দাঁড়াবে। অসীমের এই ছবি ক'খানা সেরেই ওতে হাত দেবো।"

কাজ পাইয়া হরিচরণের লুপ্ত উৎসাহ ও আশা আবার ফিরিয়া আসিয়াছে দেখিয়া বিশে' আনন্দিত হইল।

কিন্তু যখন হরিচরণ স্নান করতে গেল তখন তার কান্না পাইতে লাগিল। আজ সে রাঁধিরাছে সুধু নিম ঝোল আর আলু ভাতে। কেমন করিয়া স্বামীর সামনে এই খাদ্য পরিবেষণ করিবে তাই ভাবিয়া তার কান্না পাইতে লাগিল।

অসীম যে নোটখানা দিয়া গিয়াছিল, হরিচরণ তার কথা ভুলিয়া গিয়াছিল—সেখানা সেইখানেই পড়িয়া ছিল। হঠাৎ তার উপর দৃষ্টি পড়িতেই বিশে' উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। সে ছুটিয়া বাহিরে গিয়া কিছু দই ও দুটো হাঁসের ডিম কিনিয়া আনিল। ডিম দুইটা চট্ পট্ ভাজিয়া ফেলিল।

*　　*　　*　　*　　*

বড় ছবিখানা শেষ হইল।

একটা বড় এক্‌জিবিশন হইতেছিল বাছা বাছা চিত্রকরদের ছবির। খুব বাছিয়া বিচার করিয়া তার জন্য ছবি লওয়া হইতেছিল।

হরিচরণ কম্পিত বক্ষে তার ছবিখানা মুটের মাথায় চাপাইয়া লইয়া গেল রাজা প্রমোদনারায়ণের বাড়ী—সেখানেই বিচারক সমিতির আফিস।

তিন দিন হাঁটাহাঁটি করিয়া হরিচরণ কোনও খবর পাইল না। রমেশ তখন এক্‌জিবিশন লইয়া ব্যস্ত, তার দেখা পাওয়াই দায়। তিন দিন পর রমেশের সঙ্গে দেখা হইল।

রমেশ বলিল, "তুমি বেহদ্দ বেহায়া হরিদা,' নইলে আবার ঐ গাড্ডলটার কাছে ছবি নিয়ে এসেছ?"

শুষ্ক মুখে হরিচরণ বলিল, "ছবি ফেরত হ'য়েছে?"

"না, ঠিক তা হয়নি, সে কেবল বউদিদির বরাত জোর মহারাজা তো একেবারে তুচ্ছ ক'রেই উড়িয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু বরদাবাবু, ঐ আর্ট স্কুলের মাষ্টার ব'ল্লেন, ছবিখানায় promise আছে। মহারাজা তো তাকে এই মারে তো এই মারে। কিন্তু বরদাবাবু তাকে চেনেন। সে সব কথায় ঘাড় নেড়ে হাঁ হাঁ ব'লে শেষে বল্লে 'থাক ওটা'। তাই বেঁচে গেলে। ছবি দেখান হ'বে তোমার।"

আর কোনও কথা শুনিবার অবসর হরিচরণের হইল না। সে নাচিতে নাচিতে বাড়ী ছুটিয়া চলিল। বরদাবাবুর চোখে লাগিয়াছে তার ছবি—এক্‌জিবিশনে তাহা যাইবে—আর চাই কি? ছোট-বউ ধরিয়াছিল ঠিক।

বাড়ী ফিরিয়া সে আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া বিশে'র গলা জড়াইয়া ধরিল। বিশে' ক্লিষ্ট শুষ্ক মুখে বসিয়া ছিল। তার গায় হাত দিতেই হরিচরণ দেখিল, ভারী জ্বর। সে মহা ব্যস্ত হইয়া উঠিল।

বিশে বলিল, "একটু জ্বর দেখে কৃষ্ণনগরের লোকের অত ডরাতে হয় না। যাও—নেয়ে এসে খাও।"

হরিচরণ তাড়াতাড়ি স্নানাহার সারিয়া বিশে'র শয্যার পার্শ্বে আসিয়া বসিল। জ্বর ক্রমেই বাড়িয়া চলিল, সঙ্গে সঙ্গে ভয়ানক পেট ব্যথা।

অস্থির হইয়া হরিচরণ ছুটিয়া গেল ডাক্তার আনিতে।

তিন দিন পর ডাক্তার বলিলেন, "উপসর্গ ভাল নয়, পেটের ভিতর বোধ হয় একটা টিউমার হ'য়েছে—অপারেশন দরকার হ'তে পারে।"

হরিচরণ বসিয়া পড়িল।

তার পর বন্ধুদের পরামর্শ ও চেষ্টায় বিশেকে হাসপাতালে পাঠান হইল। সেখানে দেখা গেল, অবস্থা বাস্তবিকই গুরুতর, অপারেশন ছাড়া গতি নাই—কিন্তু তাতেও ফলাফল অনিশ্চিত।

হরিচরণ হাসপাতালে যায় আসে, যতক্ষণ পারে বিশে'র কাছে থাকে। বাকী সময় ঘরে বিশে'র প্রতিমূর্ত্তির কাছে বসিয়া ছট্ ফট্ করে।

যেদিন অস্ত্র প্রয়োগ হইল, সেদিন হরিচরণ হাসপাতালে গিয়া ছট্ ফট্ করিতে লাগিল। অনেক বেলায় তার বন্ধুরা তাকে ফিরাইয়া আনিল। তখন অপারেশন শেষ হইয়াছে, কিন্তু রোগিনীর জ্ঞান হয় নাই।

বাড়ী ফিরিয়া হরিচরণ মাটিতে শুইয়া পড়িয়া বিশে'র মূর্ত্তির দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিল। তার দুই চক্ষু দিয়া জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

অনেকক্ষণ পর বামাকণ্ঠে কথা শোনা গেল, "আমি আসতে পারি।"

হরিচরণ উঠিয়া বসিল, বলিল "আসুন।"

একটি তন্বঙ্গী যুবতী ঘরে প্রবেশ করিল। দেখিয়া হরিচরণ চিনিতে পারিল—ইনি নার্স, ইঁহারই হেফাজতে আছে বিশে'। ইঁহার সঙ্গে তার অনেক আলাপ হইয়াছে। সে তড়াক করিয়া লাফাইয়া উঠিল।

ব্যস্ত হইয়া হরিচরণ জিজ্ঞাসা করিল, "কি, খবর কি। আমাকে যেতে হ'বে ?"

"না খবর ভাল। আপনার স্ত্রীর জ্ঞান হ'য়েছে। এখন অবস্থা ভাল। তিনি আপনাকে একটা খবর দিতে বল্লেন, তাই খবর দিতে এসেছি।"

হরিচরণ একটা স্বস্তির দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িল।

নার্স লতিকা ঘরের চারিদিক চাহিয়া দেখিল। তার পর সে বলিল, "আপনার বোধ হয় নাওয়া-খাওয়া কিছু হয় নি।"

হরিচরণ লজ্জিত হইয়া বলিল, "না—এবেলায় আর কিছু খাব না।"

হাসিয়া লতিকা বলিল, সেই কথাই আপনার স্ত্রী বলছিলেন। তিনি বল্‌ছিলেন, তাঁর হয় তো নাওয়া-খাওয়া কিছুই হয় নি। আমি তাঁকে ব'লে এসেছি, আমি আপনার নাওয়া-খাওয়ার ব্যবস্থা ক'রে দিয়ে তবে বাড়ী

যাব—তবে বেচারী ঘুমিয়েছে। যান, উঠুন, নেয়ে আসুন। ও হরি রান্না বোধ হয় কিছু হয় নি। কি খাবেন ?”

হরিচরণ বলিল, “রান্না আর করি নি—খেতে ইচ্ছে নেই !

“সে কি কথা। খেতে হবেই—আমি যে তাঁকে কথা দিয়ে এসেছি। নিন– হাঁড়ি চড়ান। আমার হাতে খেতে আপনার আপত্তি আছে কি ?”

“না—কিছু না, কিন্তু আপনার কষ্ট করবার দরকার নেই, আমি যা হয় কিছু খাব'খন—আপনি তাকে ব'লবেন।”

হাসিয়া লতিকা বলিল, “কিন্তু মিথ্যে কথা তাঁকে বলতে পারবো না। দেখুন,—আপনি স্নান ক'রে কিছু খান—আমি দেখে যাই।”

হরিচরণ বড় বিপদে পড়িল। সে খাওয়ার কোনও জোগাড়ই করে নাই, হাতেও তার একটি পয়সা নাই। এ কয়দিন ঘর আর হাসপাতাল করিয়া সে পয়সা সংগ্রহের অবসরও পায় নাই। কিন্তু সে কথা তো এই অপরিচিতাকে বলা যায় না। সে খানিকক্ষণ হুমহাম করিয়া উপায় চিন্তা করিতে করিতে বাহির হইয়া গেল।

স্নান করিয়া সে মুদীর দোকান হইতে পয়সার মুড়ি ধার করিয়া আনিয়া লতিকাকে বলিল, “এই তো খাবার এনেছি, আপনি আর কষ্ট ক'রে দেরী ক'রবেন না—তাকে ব'ল্‌বেন।”

খাবারের নমুনাটা লতিকা আঁচ করিয়াছিল। আর কেন যে খাবার সম্বন্ধে এমন সংক্ষিপ্ত আয়োজন হইয়াছে, তাহাও সে কতকটা সন্দেহ করিয়াছিল। কাজেই সে আর বসিয়া থাকিয়া হরিচরণের লজ্জা বাড়াইল না। তাড়াতাড়ি বাড়ী গেল।

লতিকা চলিয়া গেলে হরিচরণ গোটাকয়েক মুড়ি মুখে ফেলিয়া অবশিষ্ট সরাইয়া রাখিল। তার পর অন্যমনস্কভাবে সে তার অসম্পূর্ণ একখানা ছবি লইয়া তাতে রং বুলাইতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরে একটি ঝি আসিয়া ঝাড়নে বাঁধা একটা পুঁটলী নামাইয়া তাকে একখানা চিঠি দিল।

চিটি লিখিয়াছে লতিকা। সে লিখিয়াছে,

“আপনার আজ কিছু খাওয়া হয় নি। আমি কিছু খাবার পাঠাইলাম, দয়া ক'রে খাবেন। নইলে আপনার স্ত্রীর কাছে আমি কথাটা গোপন

ক'রতে পারবো না, আর বেচারা ভেবে ভেবে সারা হ'বে। সে বলছিল, আপনি না কি বড় তাল ভোলা, নিজে নিজের কিছুই ক'রতে পারেন না, কাজেই স্ত্রী না থাকায় বড় কষ্ট পাবেন। দয়া ক'রে যতদিন সে হাসপাতালে থাকে, নিজের একটু যত্ন নেবেন। আমি দু'বেলা আপনাকে খবর দেব।"

চিঠি পড়িয়া হরিচরণের চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল। সে খাবারের সদ্ব্যবহার করিয়া চিঠির উত্তর লিখিল,

"আমি আপনার খাবার পরিতোষ পূর্ব্বক খেয়েছি। আমি আজ থেকে খাওয়া দাওয়ার উপর বিশেষ নজর দেব—আপনি ছোট-বউকে আশ্বস্ত ক'রবেন। আপনার দয়া ও সহৃদয়তার জন্য কি ব'লে ধন্যবাদ দেব জানি না।"

সেদিন সে ছবিখানা সম্পূর্ণ করিয়া বাহির হইল, নগদ তিন টাকা পকেটে করিয়া বাড়ী ফিরিল। মুদীর দোকানে দুইটা টাকা দিয়া কিছু খাদ্য সংগ্রহ করিল। বহু কষ্টে উনান ধরাইয়া রান্নার উদ্যোগ করিতে লাগিল। তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে।

নার্স লতিকা তখন আসিয়া উপস্থিত হইল। হরিচরণ তরকারী কুটিতেছিল, উঠিয়া দাঁড়াইল।

লতিকা বলিল, "উনি এ বেলাও ভালই আছেন, তবে অতবড় ভারী অপারেশন, বড্ড টন্ টন্ ক'রছে। কিন্তু নিজের ব্যথার কথার জ্ঞান নেই তাঁ'র—খালি ভাবছেন আপনার কথা।"

হাসিয়া হরিচরণ বলিল, "এই তো দেখছেন আমি রান্নার আয়োজন ক'রে নিয়েছি।"

"তা তো দেখছি, কি রাঁধবেন?"

"কি আর রাঁধবো, ডাল, ভাত, আর দু'টো ভাজা।"

"রাঁধতে জানেন তো?" লতিকা হাসিল।

"জানি! একেবারে ওস্তাদ! দেখুন না—আয়োজন দেখেই বুঝতে পারবেন।"

লতিকা জিনিসপত্রগুলি নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিল। মুগের ডাল আছে, কিন্তু তার উপযুক্ত ফোড়নের কোনও ব্যবস্থা নাই, তেলও অপ্রচুর। বুঝিল বিশে' মিথ্যা বলে নাই, লোকটি নিজের ভার বইবার যোগ্য নয়।

সে বলিল, "হ'য়েছে, এই দিয়ে মুগের ডাল রাঁধবেন? মসলা কই, ফোড়ন কই?"

ফোড়ন বাবদ দু'টো শুকনো লঙ্কা দেখাইয়া হরিচরণ বলিল, "এতেই হবে।"

হাসিয়া লতিকা বলিল, "ছাই হবে।" তার পর সে আবশ্যক জিনিসের ফর্দ্দ দিয়া হরিচরণকে আবার দোকানে পাঠাইল।

হরিচরণ ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, চাল-ডাল একসঙ্গে হাঁড়িতে চড়ান হইয়াছে, লতিকা মসলা বাটিতেছে।

"এ কি, এ ভারী অন্যায়—আপনি এত কষ্ট ক'রছেন। ছি!"

"কি ক'রবো, নইলে আমার রুগী ভাল ক'রে তুলবো কেমন ক'রে? দু'দিন আপনাকে রান্না শিখিয়ে যাই।"

সে বেলায় হরিচরণ খিচুড়ী বেশ তৃপ্তির সঙ্গে খাইল, লতিকাকেও কিছু খাইতে হইল।

তার পর লতিকা রোজ দু-বেলা আসে, হরিচরণ ত্রস্তে-ব্যস্তে তার আসিবার আগেই যা হ'ক কিছু রাঁধিয়া রাখে—পাছে সে আবার রাঁধিতে লাগিয়া যায়।

হাসপাতালে যতক্ষণ সে বিশের কাছে থাকে, ততক্ষণ লতিকাও প্রায় থাকে।

সেবা দিয়া, দরদ দিয়া মেয়েটি তাকে তেমনি করিয়া বেষ্টন করিয়া রাখিল, যেমন পাখী তার ডিমটিকে রাখে।

৯

পরের দিন হাসপাতালে গিয়া হরিচরণ দেখিল, বিশে'র জ্বর হইয়াছে! —বেশ গরম গা।

ব্যস্ত হইয়া সে লতিকাকে জিজ্ঞাসা করিল, লতিকা বলিল, "অপারেশনের পরে অমন এক আধটুকু হয়—ব্যস্ত হবেন না।" কিন্তু সে বেশী কথা বলিল না, মুখ ফিরাইয়া চলিয়া গেল। হরিচরণ ব্যাকুল নয়ন স্ত্রীর ক্লিষ্ট মুখের উপর বসাইয়া দিয়া বসিয়া রহিল।

বিশে' বলিল, "তুমি এ বালা জোড়া খুলে নিয়ে যাও।"

"কেন?"

"হাসপাতাল। কে জানে কখন বেহুঁস হয়ে থাক্‌বো—"

"পাগল, এখানে কোনও ভয় নেই।"

একটু পরে বিশে' বলিল, "আর ছবি বেচেছ?"

"হাঁ একখানা বেচেছি, তিন টাকায়।"

"তবে?"

"তবে কি?"

"তোমার চলবে কেমন ক'রে, ছবি তুমি এখন যা আঁকবে, সে আমি জানি।"

"না ছোট-বউ, আমি রোজ ছবি আঁকবো—আর এখন আমার ছবি নেবে সবাই—এক্‌জিবিশনে ছবি নিয়েছে কি না।"

"তা হোক, বালা জোড়া তুমি নিয়ে যাও।"

হরিচরণের বুক ফাটিয়া কান্না পাইল। সে বলিল, "কক্ষনো না। তোর সব তো খেয়েছি, এটা আর নেব না।"

মধুর হাসি হাসিয়া বিশে' বলিল, "এক্‌জিবিশনের ছবি বিক্রী হ'লেই তো আবার হ'বে—তবে দোষ কি?"

"তা হয় হোক, কিন্তু তোর হাতের বালা আমি এখন বেচবো না।"

"নাই বেচলে, বাঁধা দেও গে।"

কিছুতেই সে হরিচরণকে রাজী করিতে পারিল না।

নিরূপিত সময় উত্তীর্ণ হইলে হরিচরণ মন ভার করিয়া বাড়ী গেল,—লতিকার আশ্বাসে তার মন ভরিল না।

দ্বিপ্রহরে লতিকা হরিচরণের কাছে আসিয়া বলিল, "এই নিন, বউ বালা জোড়া পাঠিয়ে দিয়েছে, কিছুতেই শুনলে না।"

হরিচরণের চক্ষু দিয়া ঝর ঝর করিয়া জল গড়াইয়া পড়িল। লতিকারও চক্ষু ছল ছল করিতে লাগিল।

শেষে লতিকা বলিল, "মিথ্যে অত ভাবছেন আপনি, বউ ভাল হবে—আবার আপনার ঘরে ফিরে আসবে। বালা জোড়া রেখেই দিন না হয়।"

"আমার কি আছে, কোথায়ই বা রাখবো—তার চেয়ে ওটা আপনার কাছেই থাক।"

তাই রহিল।

লতিকা বলিল, "আমার ঘরের জন্য একখানা মানানসই ছবি দেবেন আমায়। খুব বেশী দামী না হয়—পাঁচ ছ' টাকার মধ্যে।"

হরিচরণ বলিল, "আচ্ছা দেব এঁকে—কাল পাবেন।"

ছবিখানা সন্ধ্যার সময় শেষ হইয়া গেল। লতিকা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেল। বলিল, "কি চমৎকার হ'য়েছে! আর বেশ বড় হ'য়েছে। কিন্তু দাম বেশী হ'বে না?"

হরিচরণ বলিল, "এ ছবির দাম নেই—অমূল্য!—এ তো শুধু ছবি নয়—আমার মূর্ত্ত কৃতজ্ঞতা। দাম এর নিতে পারবো না আমি।"

লতিকা একটু বিব্রত হইয়া বলিল, "কিন্তু তা' আমি কেমন ক'রে নেব, আপনার কিছু দাম নিতে হ'বে।"

"বেশ—দাম দেবেন ছোট-বউকে—তাকে যা ভালবাসছেন, তার চেয়েও যদি পারেন তো বেশী ভালবাসবেন।—হাঁ সে এ বেলা কেমন আছে?"

"একই রকম! জ্বরটা ছাড়ছে না।" লতিকার মুখটা খুব প্রফুল্ল দেখা গেল না।

ব্যগ্রভাবে হরিচরণ বলিল, "ভয় আছে কিছু?"

"বিশেষ নয়—একটু সেপ্টিক হবে তা ডাক্তার আগেই ব'লেছিলেন—কিন্তু জ্বরটা না বাড়লেই ভাল।"

"তবে ভয় যথেষ্টই আছে!" বলিয়া হরিচরণ হাত-পা ছাড়িয়া হতাশ হইয়া বসিয়া পড়িল।

স্নিগ্ধ কণ্ঠে লতিকা বলিল, "দেখুন, আপনি অতটা এলিয়ে পড়বেন না। এতটা ভয় পাবার কিছু হয় নি।"

বাষ্পাকুল কণ্ঠে হরিচরণ বলিল, "কিন্তু আমার মন বলছে, সিষ্টার—ছোট-বউ আমায় ছেড়ে যাচ্ছে।"

একটু হাসিয়া লতিকা বলিল, "অমন অনেক দেখেছি হরিচরণ বাবু—রোগীর স্বামী বা স্ত্রীর মন ব'লেছে বুঝি রোগী বাঁচবে না, অথচ এখন তারা দিব্যি সুস্থ হ'য়ে সংসার ক'রছে। সামান্য একটু সেপ্টিক—এতে এত ভয় পাবার কিছু নেই।"

আজ হরিচরণ খাবাবের জোগাড় করিতে ভুলিয়াছিল। লতিকা তার আহারের উদ্যোগ করিয়া দিয়া একটু বেশী রাত্রে বাড়ী ফিরিল। ছবিখানা যত্ন করিয়া সে লইয়া গেল।

সে চলিয়া গেলে হরিচরণ দেখিল বিছানার উপর পাঁচটা টাকা রহিয়াছে।

হরিচরণ স্থির করিল, টাকা পাঁচটা ফিরাইয়া দিবে। এই দেবীর কাছে টাকা লওয়া তার পক্ষে একটা অমার্জ্জনীয় অপরাধ হইবে।

কিন্তু যখন বাড়ীওয়ালা ভাড়ার জন্য কড়া তাগাদা লাগাইল, তখন তাকে সেই টাকা পাঁচটা দিয়াই নিরস্ত করিতে হইল।

* * * *

সকালে উঠিয়াই হরিচরণ হাসপাতাল যায়—সেখানে অনেকক্ষণ বসিয়া তবে সে বিশে'র কাছে যাইতে পায়।

সেদিন তার পাশে এক ভদ্রলোক একখানা খবরের কাগজ পড়িতেছিলেন। হরিচরণ দেখিতে পাইল, তাতে একজিবিশনের ছবির সম্বন্ধে একটা বড় প্রবন্ধ আছে। অমনি উদ্‌গ্রীব হইয়া মুখ বাড়াইয়া সে তাহা পড়িতে চেষ্টা করিল। ভদ্রলোক তখন পাতা উল্টাইলেন—আর পড়া হইল না। হরিচরণ ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল। একটু পরে ভদ্রলোক

কাগজখানা মুড়াইয়া পাশে রাখিয়া দিলেন, হরিচরণ বলিল, "কাগজখানা একবার দেখতে পারি ?"

ভদ্রলোক ভ্রূকুটি করিয়া তার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "না।"

মুখ চুণ করিয়া হরিচরণ বসিয়া রহিল।

তার সঙ্গে পয়সা নাই—কাগজ কিনিবার সঙ্গতি নাই।

একটু পরে আর এক ভদ্রলোক একটু তফাৎ হইতে উঠিয়া আসিয়া হরিচরণকে একখানা কাগজ দিয়া বলিলেন, "নিন, পড়ুন।" ইনি তফাৎ হইতে অপর ব্যক্তির অভদ্র আচরণ দেখিয়াছিলেন।

ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া হরিচরণ কাগজখানা উল্টাইয়া একজিবিশনের বিবরণ পড়িতে লাগিল। প্রবন্ধে "উল্লেখযোগ্য" ছবিগুলির একটা বিবরণ ছিল। একে একে সেগুলি হরিচরণ পড়িল। কয়েকজন নামজাদা চিত্রকরের কযেকখানা ছবির বিস্তৃত প্রশংসা তাড়াতাড়ি অতিক্রম করিয়া সে পড়িল, "এবার নূতন যারা আসরে নামিয়াছে, তাদের মধ্যে—"তার বুক দুড়, দুড়, করিতে লাগিল—অনেকগুলি চিত্রকরের নাম ও সংক্ষিপ্ত প্রশংসা আছে —কিন্তু তার মধ্যে হরিচরণের নাম নাই। শেষের প্যারাগ্রাফে 'অপরাপর চিত্র' বলিয়া কতকগুলি ছবির নামমাত্র উল্লেখ হইয়াছে—তার ভিতরও হরিচরণের ছবির উল্লেখ নাই।

একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া হরিচরণ কাগজখানা ফিরাইয়া দিল। তার মনটা একেবারে ভাঙ্গিয়া গেল। এই তবে সাধারণের অভিমত! যে ছবি আঁকিয়া সে খ্যাতি অর্জ্জনের পথ পাইবে বলিয়া আশা করিয়াছিল—সে ছবির এই মর্য্যাদা!

অনেকক্ষণ পর সে মাথা নাড়া দিয়া মনে মনে বলিল, "চুলোয় যা'ক ও অলক্ষুণে ছবি। বিশে যদি ভাল হ'য়ে ওঠে তবে ও ছবি যা'ক!"

তখন তাদের রোগীদের সঙ্গে দেখা করিবার অনুমতি দেওয়া হইল। হরিচরণ ত্রস্ত পদক্ষেপে হাসপাতালের ভিতর প্রবেশ করিল।

বিশে বিছানায় পড়িয়া ছিল—শুকনো একটা লতার মত। তার গাল ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, চক্ষু দু'টি কোটরে প্রবিষ্ট হইয়াছে; আর তার চার পাশে একটা গভীর কালো ছায়া পড়িয়াছে। হরিচরণ বিছানার পাশে আসিতে বিশে কষ্টে তার ক্লান্ত চক্ষের পাতা টানিয়া তুলিয়া তৃষিত নয়নে তার দিকে

চাহিল—হরিচরণ বসিয়া তা'র মুখের কাছে মুখ লইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন আছ ?"

একটু ম্লান হাসি হাসিয়া বিশে বলিল, "এখন ভালই আছি।"

লতিকা আসিয়া হরিচরণের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া ছিল। সে বিশের কথা শুনিয়া তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইল—সে অশ্রুরোধ করিতে পারিল না।

বিশে এক মুহূর্ত্ত আগে অসহ্য যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতেছিল। হরিচরণ আসিতেছে শুনিয়াই সে চুপ করিয়াছিল—আর এখন স্বামীর প্রশ্নের উত্তরে শান্তভাবে বলিল, "ভালই আছি।" পতিপ্রাণা বালিকার এ করুণ ছলনায় লতিকার বুক ঠেলিয়া কান্না পাইল। নার্স সে—রোগী ঘাঁটাই তার ব্যবসা—কত রোগীই তো তার হাতে মরিয়াছে—কিন্তু এমন বিচলিত সে কোনও দিন হয় নাই।

লতিকা তাড়াতাড়ি অন্য রোগী লইয়া ব্যস্ত হইল।

হঠাৎ বিশের মুখখানা শক্ত হইয়া উঠিল, একটা বিষম বেদনার ছায়া তার মুখ ছাইয়া ফেলিল। হরিচরণ ব্যস্ত হইয়া বলিল, "কি হ'য়েছে ছোট-বউ ? অমন ক'রছো কেন ?"

বিশের ব্যথাটা তখন ভয়ানক চাড় দিয়া উঠিয়াছিল—একটা প্রচণ্ড শক্তি প্রয়োগ করিয়া সে সেই বেদনার প্রকাশটা দমন করিবার চেষ্টা করিতেছিল। এক মুহূর্ত্ত সে কথা কহিতে পারিল না—হরিচরণ ব্যস্ত হইয়া লতিকাকে ডাকিল, "নার্স, দেখুন তো কি হ'ল ?"

তখন বিশের ব্যথার বেগটা একটু কমিয়াছিল—সে বলিল, "না, ও কিছু না—তুমি ব্যস্ত হ'য়ো না।"

লতিকা দেখিয়া ব্যাপার বুঝিল। সেও সংক্ষেপে বলিল, "ও কিছু নয়।" বলিয়া মুখ ফিরাইল। এই বালিকার স্বামীর কাছে তার দুঃখকষ্ট গোপন করিবার মর্ম্মান্তিক চেষ্টার করুণ দৃশ্য সে কিছুতেই শান্ত হইয়া দেখিতে পারিতেছিল না।

বিশে বলিল, "তোমার ছবির কি হ'ল ?"

"ছাই ছবি ! সে সব কোন কথাই ভাবতে পারছি না ছোট-বউ, যতক্ষণ তুই না ফিরছিস।"

"এমন পাগল তুমি। খবরটা নিও, আমার ভারি শুনতে ইচ্ছে ক'রছে।"

"আচ্ছা জেনে তোকে জানাব।" হরিচরণের অন্তরে ভিতর হাহাকার করিয়া উঠিল। কি শুনাইবে সে বিশেকে?—তার অশ্লাঘ্য পরাজয়ের কথা শুনিলে যে বিশের বুক ভাঙ্গিয়া যাইবে!

"আর ছবি এঁকেছ?"

"হাঁ।"

"কত পেলে?"

"পাঁচ টাকা।" এ কথা বলিতেও হরিচরণের বুকে ব্যথা বাজিল। এই পাঁচ টাকা সে নিতে বাধ্য হইয়াছে লতিকার কাছে। এটা যে তার কাছে কতদূর অকৃতজ্ঞতার কাজ হইয়াছে, সেই কথা স্মরণ করিয়া সে মর্ম্মে মরিয়া ছিল।

হরিচরণ বলিল, "সে যা'ক গে, তুমি কেমন আছ? কালকের চেয়ে আজ একটু ভাল?"

হঠাৎ আবার ব্যথার বেগ হইয়া বিশে'র মুখ সাদা এবং শক্ত হইয়া গেল। সে শুধু ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, "না।"

হরিচরণের মন একেবারে কালিতে ভরিয়া গেল। ভয়নক আশঙ্কায় তার বুক কাঁপিয়া উঠিল। তার বুক ঠেলিয়া কান্না উঠিতে লাগিল—বিশে কি তবে বাঁচিবে না?

খানিকক্ষণ পরে বিশে বলিল, "যাক গে, আমার কথা থাক, তোমার কথা বল। নার্স বলছিল, তুমি না কি ভারি মন-মরা হ'য়ে থাক।"

হরিচরণ কথা বলিল না, মাথা নীচু করিয়া রহিল।

বিশে আবার বলিল, "ছি, বেটাছেলের কি একটা মেয়েমানুষের জন্য অত ভাবতে আছে?"

"তোর জন্য ভাবব না ছোট বউ, এই না হ'লে যদি বেটাছেলে না হওয়া যায়, তবে আমি বেটাছেলে নই, চাই না হ'তে।"

বিশে তার অস্থিচর্ম্মসার হাতখানা হরিচরণের হাতের উপর রাখিয়া বলিল, "ছি।" কিন্তু এ কথায় তার মুখে একটা অপূর্ব্ব তৃপ্তি ফুটিয়া উঠিল, ক্ষীণ চক্ষু তার বুকভরা প্রেম, প্রাণভরা কৃতজ্ঞতায় সজীব হইয়া উঠিল।

হরিচরণ বিশের হাতখানা দু'হাতে চাপিয়া ধরিল। সে অনুভব করিল,

বি্শের আঙ্গুলের ডগাগুলি থর থর করিয়া কাঁপিতেছে। সেই কম্পনে একটা বিদ্যুৎ-প্রবাহ যেন তার হৃদ্‌যন্ত্রের ভিতর দিয়া গিয়া তাহা অসাড় করিয়া দিল। তার বড় ভয় হইল।

সে উঠিয়া লতিকাকে নিভৃতে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "নার্স, ওর আঙ্গুলগুলো অমন কাঁপ্‌ছে কেন?"

লতিকা হাসিয়া বলিল, "ও কিছু নয়, দুর্ব্বল কি না?" কিন্তু চট করিয়া সে কার্য্যান্তরে চলিয়া গেল।

লতিকা জানিত এ কাঁপনের অর্থ কি—তাই সে এড়াইয়া গেল।

হরিচরণ আবার আসিয়া বিশের কাছে বসিল। বিশে তখন ঘুমের মত হইয়া পড়িয়া ছিল। হরিচরণ কথা কহিল না, নীরবে তার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তার পর তার নির্দ্দিষ্ট সময় অতীত হইলে সে চলিয়া গেল।

হরিচরণ চলিয়া গেলে লতিকা আসিয়া বিশেকে দেখিল। হরিচরণ যাকে ঘুম মনে করিয়াছিল—সে ঘুম নয় মোহ। দেখিয়া লতিকা দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ত্যাগ করিল। তার পর সে লতিকার নাড়ী দেখিয়া মুখ ভার করিয়া ডাক্তারকে সংবাদ দিল।

এমনি ভাবে সাত দিন কাটিয়া গেল। বিশের মোহ মাঝে মাঝে একটু কাটে—কিন্তু কথা তার বড় এলোমেলো। শুনিয়া হরিচরণের প্রাণ হাহাকার করিয়া ওঠে। সে দু'হাতে মুখ চাপিয়া বাহিরে চলিয়া যায়, আবার ফিরিয়া আসে। এ দৃশ্য দেখিতে তার বুক ফাটিয়া যায়, তবু বার বার দেখিতে চায়—সর্বদা দেখিতে পায় না বলিয়া সে আকুল হয়।

সাত দিন পর সকাল-বেলায় বিশে চোখ মেলিয়া এদিক ওদিক চাহিল—আজ তার দৃষ্টি স্পষ্ট, অর্থপূর্ণ। লতিকা নাড়ী দেখিয়া খুসী হইল। সে হরিচরণকে ডাকিয়া আনিল।

হরিচরণকে বিশে বলিল, "আজ ভাল আছি।"

এতদিন পর তার মুখে সহজ কথা শুনিয়া হরিচরণ উৎফুল্ল হইল।

লতিকা বলিল, "বেশী কথা কয়ো না বোন, ক্লান্ত হ'য়ে প'ড়বে।"

বিশের মুখে দ্বিতীয়ার চাঁদের মত একটা শীর্ণ হাসি খেলিয়া গেল।

সে সলজ্জ ভাবে বলিল, "আচ্ছা।" তারপর হরিচরণকে বলিল, "সকালে কিছু খেয়েছ?"

হরিচরণ বলিল, “না।”

“তবে তুমি সকাল সকাল গিয়ে খাওগে। তোমার মুখ শুকিয়ে গেছে। —বালা বেচেছ?”

“না ছোট-বউ, এমনি চ'লে যাচ্ছে তো।”

“আচ্ছা, ওটা ভাল ক'রে রেখে দিও। হাঁ—সে ছবির কি হ'ল?”

“এখনও কিছু হয় নি। কিন্তু তুমি আর কথা বলো না,- তার চেয়ে আমি সব কথা বলি শোন। দাদা এসেছেন, বউদি তাঁকে পাঠিয়ে দিয়েছেন তোমার চিকিৎসার ব্যবস্থা ক'রতে—ব'লে দিয়েছেন, তোমাকে ভাল ক'রে বাড়ী নিয়ে যেতে।”

“কৃষ্ণনগর?—সেখানে আর যাব না।”

“কেন?”

“মনে নেই, তারা তোমার কি অপমান ক'রেছে? সেখানে আর যেও না।

“আচ্ছা যাক, সে কথা পরে হবে। তুমি তো আগে ভাল হও।”

সেদিন হরিচরণ বেশ উৎফুল্ল-চিত্তে বাড়ী ফিরিল। চৈতন বাসায় বসিয়া ছিল, তার কাছে বলিল, “ছোট-বউ বেশ ভাল আছে।”

চৈতন্ন রাঁধিয়া বসিয়া ছিল। বেশ তৃপ্তির সহিত আহার করিয়া আজ সাতদিন পর হরিচরণ একটু শান্তভাবে ঘুমাইল।

বেলা তিনটার সময় হঠাৎ লতিকা ছুটিয়া তার ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিল, “শীগগীর আসুন।”

অগ্রসর হইতে হইতে হরিচরণ বলিল, “কেন, কি হয়েছে?”

—“দেখুন. একটু সুস্থির হ'য়ে থাকবেন—আপনার স্ত্রীর অবস্থা ভাল নয়।”

চৈতন চমকাইয়া উঠিল, হরিচরণের পা যেন মাটিতে বসিয়া গেল। তাঁরা দু'জনেই লতিকার পিছু পিছু ছুটিল।

লতিকা ট্যাক্সি করিয়া আসিয়াছিল, তারা তার উপর চড়িয়া বসিল।

হাসপাতালে গিয়া তারা দেখিল, বিশের শেষ সন্নিকট।

একবার স্বামীর দিকে চাহিয়া সাধ্বী জন্মের মত চক্ষু বুজিল।

চৈতন ও হরিচরণ হাহাকার করিয়া উঠিল।

১০

পরের দিন সকালবেলায় চৈতন সাশ্রুনয়নে বলিল, "ভাই, যা' হ'বার তা তো হ'য়ে গেছে—এখন তুই ঘরে ফিরে চল্।"

হরিচরণ শুষ্ক উদাস দৃষ্টিতে বিশে'র মৃন্ময়ী মূর্ত্তিখানার দিকে চাহিয়া বসিয়াছিল। সে কোনও কথা কহিল না—শুধু ঘাড় নাড়িয়া অস্বীকার করিল।

চৈতন বলিল, "লক্ষ্মী ভাই আমার, আর রাগ ক'রে থাকিস না; আমাদের বড় ঘাট হ'য়েছে ভাই, তাই শাস্তি বউমা দিয়ে গেল, তুই আমাদের মাপ ক'রে ঘরে চল্!"

হরিচরণ কোনও কথা বলিল না। চৈতন বলিয়া গেল, "আর, আমরাই না হয় দোষ ক'রেছি, বড়-বউ তো কোনও দোষ করে নি। সে যে তোদের দু'জনের জন্যে দিনরাত হেদিয়ে ম'রছে। সে যে আশা ক'রে ব'সে আছে—আমি বউমাকে ফিরিয়ে নেব। তুই যদি না যাস্, তবে আমি কেমন ক'রে ঘরে উঠে তার কাছে মুখ দেখাব।"

হরিচরণ একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "আমার তো কাউকে মুখ দেখাবার পথ নেই দাদা—আমাকে আর ডেকো না।"

তার পর সে বলিয়া গেল, "বড় দেমাক ক'রে বাড়ী থেকে বেরিয়েছিলাম—বড় তেজ ক'রে ছোট-বউকে নিয়ে এসেছিলাম। তাকে খেতে দিতে পারি নি। তার গয়না বেচে খেয়েছি, তার পর তাকে না খাইয়ে মেরেছি। কোন্ মুখে ফিরে যাব?" হরিচরণ হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

চৈতনও তার চক্ষু মুছিয়া বলিল, "যা হ'য়েছে তার তো চারা নেই ভাই। এখন ঘরের ছেলে ঘরে চল—আবার বে' থা কর—দেখে আমরা চক্ষু জুড়োই।"

হঠাৎ হরিচরণ ক্ষেপিয়া উঠিল—সে বলিল, "কি সাহসে তুমি আমাকে এ কথা ব'লছো? বে' ক'রবো—ছোট-বউকে না খাইয়ে মেরেছি—আবার

আমি বে' ক'রবো। ওঃ! ছোট-বউ সাধে কি মরবার আগে শেষ কথা আমার ব'লেছিল, তুমি আর সেখানে যেও না'—সে চিনেছিল তোমরা কত ছোটলোক।"

চৈতন মনে বাস্তবিকই খুব আঘাত পাইয়াছিল; আর বিশের মৃত্যুতে তার অসহায় হরিচরণের প্রতি পুরাতন স্নেহ জাগিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু তাই বলিয়া ছোট ভাই তাকে মুখের উপর ছোটলোক বলিবে,—কি না সে দু-পাতা বই পড়িয়াছে, আর দু-বছর কলিকাতায় থাকিয়াছে—এতটা তার সহ্য হইবে, এতবড় মহাপুরুষ চৈতন নয়। কাজেই হরিচরণের কথায় চটিয়া সে গালমন্দ করিল। হরিচরণও চটিয়া উঠিল—সে অম্লানবদনে চৈতনকে বিশে'র হত্যাকারী বলিয়া গেল। বলিল, "অমন সতীলক্ষ্মী বউকে মেরে ফেলেছ তুমি—আজ আবার মায়াকান্না গাইতে এসেছ? লজ্জা করে না? যাও বেরোও।"

চৈতন ফুলিতে ফুলিতে বাহির হইয়া গেল। হরিচরণ গুম হইয়া কিছুক্ষণ বসিয়া রহিল। তার মাথার ভিতর রাজ্যের কথা তোলপাড় করিতে লাগিল, বুকের ভিতর বিশের ব্যথা হাতুড়ি পিটিতে লাগিল।

তারপর সে মুখ তুলিল। ঘরের কোণায় কড়াই, চাটু, হাতা পড়িয়াছিল—তার চক্ষে ভাসিয়া উঠিল, একে একে বিশের বহুচিত্র—ওইখানে বসিয়া ওই বাসনে সে রাঁধিত কি অপরূপ সুন্দর সে মূর্ত্তি। কতদিন রাঁধিতে রাঁধিতে সে কত না কৌতুক করিয়াছে, কত প্রেমের অভিনয় হইয়া গেছে। একটি একটি করিয়া সেই সব তার মনে পড়িল। সে হাহাকার করিয়া উঠিল—চীৎকার করিয়া বলিল, "ছোট-বউ, এ কি করলি?"

আবার সে চাহিল বিশে'র মৃণ্ময়ী মূর্ত্তির উপর—তার ঠোঁটের উপর বিশের সেই কৌতুক হাসি তখনও লাগিয়া আছে। অতৃপ্ত-নয়নে হরিচরণ তার দিকে চাহিয়া রহিল।

মনে পড়িল, একদিন কৌতুক করিয়া সে বিশেকে বলিয়াছিল—বিশের চেয়ে তার এই মূর্ত্তির উপর তার দরদ বেশী। এ মূর্ত্তি সে বেচিতে পারিবে না, বরং বিশে'কে বেচিয়া দিবে। বুকের ভিতর এ কথায় যেন তপ্ত-লোহার শলা বিঁধিয়া গেল। হায়, আজ সে বিশেকে সত্যই বিলাইয়া দিয়াছে,—পোড়াইয়া ছাই করিয়াছে—আজ আছে তার শুধু এই মাটির ডেলা। কোন

দুষ্ট ভগবান কি আড়ালে বসিয়া তার কৌতুকের কথাটা কাড়িয়া তাকে এমনি শাস্তি দিয়াছেন। মনে পড়িল একদিন ভূপেন বলিয়াছিল, ভগবান আছেন, কেবল মানুষকে কষ্ট দিবার জন্য—আজ তার মনে হইল, সেই কথাই ঠিক। মিছাই মানুষ ভাবে ভগবান দয়াময়—নিষ্ঠুর নিষ্ঠুর ভগবান—মানুষের ব্যথা তাঁর কাছে শুধু খেলার ঘুঁটি।

না—ভগবান নাই—আছে শুধু একটা নির্ম্মম বিশ্বপ্রবাহ—অসীম বলে ঠিক। নহিলে যদি বিশ্বের গোড়ায় এক ফোঁটা করুণা থাকিত—তবে কি বিশেকে এমন করিয়া তার বুক হইতে ছিঁড়িয়া লইতে পারিত—তার বাইশ বৎসর মাত্র বয়সে! যদি ন্যায়-ধর্ম্ম থাকিত, তবে কি নিরাপরাধা পুণ্যবতী সতী বিশ্বেশ্বরী এত কষ্ট পায়! আর হরিচরণ নিজে—জ্ঞানে সে কোনও পাপ করে নাই, কখনও কারও অনিষ্ট চিন্তা করে নাই—তারই বা এ শাস্তি কিসে? মিছা কথা—ভগবান নাই।

দারুণ বেদনায় হরিচরণ মুশড়াইয়া পড়িল। দরজা দিয়া বাহিরের দিকে সে চাহিয়া দেখিল—একটা ভাঙ্গা হাঁড়িতে বিশে একটা তুলসী গাছ পুঁতিয়াছিল। সে রোজ তাতে জল দিত, গলবস্ত্র হইয়া তার কাছে গড় হইয়া প্রণাম করিত। প্রায়ই সে এক পয়সার বাতাসা আনিয়া তুলসী-তলায় হরির লুট দিত। এতদিন হরিচরণ সে দিকে চাহে নাই, গাছটি শুকাইয়া গিয়াছে। হরিচরণের চোখে ভাসিয়া উঠিল, তুলসীতলায় বিশে'র প্রণত-মূর্ত্তি—এক মুহূর্ত্ত সে মুগ্ধ হইয়া সে মূর্ত্তির ধ্যান করিল। তার পর কঠোর হাসি হাসিয়া বলিল, কাকে প্রণাম করতিস ছোট-বউ—ওই দেখ সে শুধু শুকনো কাঠ। তুলসীতে নারায়ণ থাকেন! থাকতো যদি তবে তোর এমন পূজোর এমনি পুরস্কার হয়? কচি মেয়ে—সাদা মন তার—তার পূজো নিয়ে এমনি বেইমানি মানুষে ক'রতে পারে না।—নারায়ণ কি মানুষের অধম?"

যে দিকে চায় হরিচরণ, সেই দিকে তার চোখ পড়ে এমনি ছোট খাট কত জিনিস, যার প্রত্যেকটির সঙ্গে বিশের বিষাক্ত মধুর স্মৃতি জড়ান আছে। চাহিয়া চাহিয়া হরিচরণের মনের ভিতর আগুন দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। সে মেঝের উপর চিৎ হইয়া শুইয়া চালের দিকে বদ্ধদৃষ্টি হইয়া পড়িয়া রহিল।

অসীম আসিল। হরিচরণকে একলা দেখিয়া সে ব্যস্ত হইয়া উঠিল।

তারা সব-কটি বন্ধু সারারাত্রি হরিচরণের কাছে ছিল, সকাল বেলায় তারা তাকে চৈতনের কাছে রাখিয়া গিয়াছিল।

অসীম বলিল, "এ কি? তুমি একলা? তোমার দাদা গেল কোথা?"

হরিচরণ বলিল, "চলে গেছে—বেঁচেছি!"

অসীম তার শিয়রের কাছে বসিয়া অশেষ করুণার সহিত তার মুখের দিকে চাহিল। হরিচরণ চালের দিকে চাহিয়া রহিল। কেহ কোনও কথা কহিল না।

অনেকক্ষণ পর হরিচরণ বেগের সহিত উঠিয়া বসিল। উত্তেজিত ভাবে অসীমকে বলিল, "অসীমদা তোমার কথা ঠিক—ভগবান নেই।"

কথাটা অসীমের হৃদয়ে ব্যথা দিল। সে একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "না ভাই, ভগবান আছেন। তিনি আমাদের মনের মত ভগবান নন,—আমরা যা চাই, ঠিক তাই তিনি করেন না—কিন্তু আছেন।"

"থাকুন তিনি—তাঁকে দিয়ে আমার প্রয়োজন নেই। যে ভগবানের করুণা নেই, ন্যায়-বিচার নেই, মানুষ দুঃখে যার কাছে অভয় পাবে না, সেই কঠোর-নির্ম্মম-পাথরের ভগবান তোমার—থাকুন তিনি, তিনি আমার কেউ নয়।"

অসীম কিছুক্ষণ কোনও কথা বলিল না, হরিচরণের মাথায় সস্নেহে হাত বুলাইতে লাগিল। তার পর সে হাসিয়া উঠিল। হরিচরণের এ হাসি ভাল লাগিল না। সে অপ্রসন্ন দৃষ্টিতে তার দিকে চাহিল।

অসীম হাসিতে হাসিতে বলিয়া গেল,

কাঠ খড় মাটী দিয়ে গড়িনু দেবতা,
নিবেদিনু তারে মোর দুঃখের বারতা।
কাঁদিলাম তার পায়, খুঁড়িলাম মাথা—
কাণা বোবা দেখিল না শুনিলনা কথা।
ছুঁড়ে ফেলে কাঠ খড়, ডুবায়ে পাথর,
মনোমাঝে গড়িলাম দেবতা অমর!
মনগড়া গুণ দিয়ে সাজাইনু তারে
কাঁদিনু তাহার কাছে—সেও শোনে না রে।

আমারি দেবতা হ'য়ে মোরে অপমান !
কহিনু অলীক দেব, মানুষের দান—
মিছে তারে মনে ক'রে মনেরে ভুলাই।—
দেবতা কহিল, "সত্য ! সে দেবতা নাই।
যারে তুমি ভাঙ্গ গড় আপনার করে
জগতের ভাঙ্গা গড়া সে তো নাহি করে।"

হরিচরণ শুনিল, কথা কহিল না।

অনেকক্ষণ পর সে বলিল, "মিথ্যে সব মিথ্যে ? জগতে যা কিছু আমাদের কাছে খুব বড় সে সব মিছে ? ভালবাসা মিছে ? ওঃ কি ভীষণ একটা ছলনা এ পৃথিবী ?"

"মিথ্যে কিছু নয় ভাই, সব সত্যি, যদি ঠিক ক'রে তাকে বোঝ। একটা তামার পয়সা হাতে ক'রে যদি তাকে মোহর ভাবতে থাক, তবে সেটা মিথ্যে—আর আজ হ'ক, কাল হ'ক সে মিথ্যেটা ধরা পড়ে যাবে। কিন্তু যদি তাকে ঠিক তামা ব'লেই জান, তবে সেটা সত্যি। মানুষের ভুলটা এইখানে। যে সব fact নিয়ে আমরা কারবার করি, তার একটাও মিথ্যা নয়, সব সত্যি। কিন্তু সেই ফ্যাক্টটুকু নিয়ে আমাদের মন খুসী নয়—আমরা তাকে মায়ার রঙে রঙিয়ে তার ভিতর কত কিছু দেখি। ভালবাসাটা সত্যি—তাতে আমরা সুখ পাই, দুঃখ পাই, সেও সত্যি। শুধু সেইটুকু নিয়ে যদি খুসী হই, তবে আমারা কোনও দিন ঠকবো না। কিন্তু তা' তো করি না আমরা। আমরা বর্ত্তমানের ফ্যাক্টটাকে দু'ধারে লম্বা ক'রে বাড়িয়ে একেবারে অনন্ত পর্য্যন্ত ঠেলে নিই। এমন একটা মোহ আমাদের হয় যে, এটা চিরদিন ছিল, চিরদিনই থাকবে—তাই আমরা ঠকি। দোষটা ভাই ভগবানের নয়, আমাদেরই। আমাদের স্বভাবই এই। হাতে একটা সুখ পেলে তাতে খুসী নই—তখনই ভয়ে মরি পাছে এ সুখ যায়—প্রাণপাত চেষ্টা করি সেই সুখটুকু বজায় রাখবার জন্য। তাকে ভোগ করার চেয়ে ব্যাঙ্কে জমা রাখবার গরজ আমাদের বেশী। অথচ, এ জগতে সুখের fixed deposit যে সত্যি হয় না, সেটা আমরা দেখেও দেখি নে।"

হরিচরণ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "ওরে ভাই, তোমার এ বর্ত্তমান-বাদ হয় তো খুব সত্যি হ'তে পারে, কিন্তু ওতে মন ভরে না। যে দিন যা

পেলাম সেইটুকু যে ভোগ করে সে না বুদ্ধিমান, না সুখী। সুখ পেতে হ'লে তা'র কতকটা পুঁজি ক'রতে হয়। এই পুঁজি করবার জন্যই সমাজ, এর অসংখ্য ছোট-বড় আয়োজন। নইলে একটা গোরুর সঙ্গে মানুষের তফাৎ কোথায়?"

"ঠিক! মন ভরে না। পুঁজি করাটাই আমাদের স্বভাব। আর সেই স্বভাবের তাড়নায় সমাজ গড়ে উঠেছে। এটা আমি দোষের বলি নে। সম্ভব মত হিসাব ক'রে খরচ করাটার সার্থকতা আছে। কিন্তু যে চিরজীবন না খেয়ে লাখ-লাখ টাকা জমা ক'রেই গেল, তার ছেলে-নাতিদের টাকা ওড়াবার জন্য,—সে পণ্ডিত নয়। সুখের পুঁজির হিসাবে একটা সময়ের সীমা আছে—সেই সীমাটা ছাড়িয়ে গেলেই মূর্খতা হয়। যে শেয়ালটা রাশি রাশি খাবার সামনে দেখে 'অদ্য ভক্ষ্য ধনুর্গুণঃ' স্থির ক'রেছিল, তার ঠিক সেই ধনুর্গুণ খেয়ে মরাটাই উপযুক্ত শাস্তি। ছোট্ট মানুষ, এতটুকু তার পরমায়ু; অথচ সে ঘর বাঁধতে চায় চিরদিনের জন্য। মৃত্যু এসে তার সব হিসাব চুরমার ক'রে দেয়। তখন সে কাঁদে, না হয় এই ব'লে বুক বাঁধে যে, 'সে মরেও মরবে না"—এই অসম্ভব অভিমানের গান,

জীবনে যত পূজা হয় নি সারা
জানি হে জানি তাও হয় নি হারা।

[illegible] সুখ চাও, তাতে আমার আপত্তি নেই, সম্ভব মত হিসাব ক'রে সুখের অপচয় কর,—কতকটা speculation জীবনে চাই-ই। কিন্তু আমরা করি কি? জীবন-সর্ব্বস্ব-পণ ক'রে জীবনের সঙ্গে জুয়া খেলি। জিতলে ফুলে উঠি, হারলে কেঁদে মরি। রেস্ খেল্‌তে গিয়ে যে জুয়ারী সর্ব্বস্ব বাজী রেখে খেলে সেই মরে। যে খেলোয়াড়, সে ভারী বাজী রাখে না, অল্প হারে বা অল্প জেতে। জিতে সে অতিরিক্ত খুসী হয় না, হেরেও গলায় দড়ি দেয় না। আমার কথা এই, জীবনটাকে খেলোয়াড়ের মত খেলতে হ'বে, জুয়ারীর মত নয়।

হরিচরণ উঠিয়া বসিল। এ সব তত্ত্বকথা তার মনের বর্ত্তমান অবস্থায় সে খুব স্পষ্ট করিয়া ভাবিতে বা আয়ত্ত করিতে পারিল না। কিন্তু কথাগুলি টুক্‌রা টুক্‌রা হইয়া তার মাথার ভিতর খেলিতে লাগিল। জীবনের জুয়া-খেলা। তার এই বাইশ বছরের জীবনেই সে কত বাজি

রাখিয়া খেলিয়াছে—আগাগোড়াই সে হারিয়া আসিয়াছে। আজ সে একেবারেই নিঃস্ব হইয়া বসিয়াছে,—আর তার বিন্দুমাত্র সম্বল নাই, এ খেলা খেলিবার। একটি ছোট্ট মেয়ে তার জীবনের সর্ব্বস্ব লুটিয়া লইয়া কোথায় উধাও হইয়া গিয়াছে—সারাজীবন ভরিয়া সে তাহাকে খুঁজিয়া পাইবে না। তার পর? মরণের পর?—তখন সে কি দেখা দিবে না তার পরিপূর্ণ মাধুরী লইয়া—ধন্য করিয়া দিবে না তার এত দিনের সাধনা,—সে কি পাইবে না তার দীর্ঘ বিরহের পূর্ণ পুরস্কার?

অনেকক্ষণ পরে সে অসীমকে বলিল, "এ হ'তেই পারে না যে এইখানেই সব শেষ। জীবনের আজ যে অধ্যায় শেষ হ'ল ভাই, সেটা সত্যি সত্যিই শেষ অধ্যায় নয়—এর একটা পরিশিষ্ট আছে মরণের পর?"

অশেষ ব্যথার সহিত অসীম তার করুণ, ক্ষণিক আশাদীপ্ত মুখের দিকে চাহিল।

"আছে, কিন্তু সেটা ঠিক তোমার মনের মত নয়। বিশ্বপ্রবাহের ভিতর কোথাও পূর্ণচ্ছেদ নেই। একটার যা' শেষ, সেটা শুধু আর একটার আরম্ভ। গাছের পাতা ঝরে পড়ে, মাটিতে সেটা পচে, তাতে জমির সার হয়, নূতন চারা তাতে খাবার পায়;—পাকা ফলটি পড়ে যায়, তার আঁটি থেকে নূতন গাছ গজায়। আজ যে শেষটা তোমার মনকে পীড়া দিচ্চে, সেটা তোমার মনের ভিতরই একটা নূতন আরম্ভের সৃষ্টি ক'রছে। তোমার জীবন তাতে ক'রে নূতন ধারায় গড়ে উঠবে। হয় তো এ আগুন শুধু তোমার মনটা পুড়িয়ে ছাই-ই ক'রবে, নয় তো সেই ছাই থেকে তোমার মনের ভূমি উর্ব্বর হ'য়ে নূতন ফসল জন্মাবে। একটি মেয়ে, তার কোলে একটি শিশু এলো—সমস্ত অন্তর তার সরস হ'য়ে উঠলো। তার পর শিশু চ'লে গেল। কিন্তু মায়ের মনটি সে সরস ক'রে রেখেই গেল—তার ফল পাবে আর কেউ। এমনি জগতের নিয়ম।"

হরিচরণ ভাবিল ঠিক, ইহাই সত্য। মৃত্যুর পর আর জীবন নাই। বৃথা এ আশায় মন ভোলান। সে অবসন্ন-হৃদয়ে আবার শুইয়া পড়িল।

অসীম কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "একজন মাড়োয়ারী ধনী, চিনির speculationএ যথাসর্ব্বস্ব পণ করেছিল—তার সব গেল। কোটি টাকার চিনি তার, মাটির সমান হ'য়ে গেল—সে তবু তাই আঁকড়ে ধ'রে

প'ড়ে রইলো—সে একেবারে গেল। আর একজন তারি মত, চিনির বাজারে প্রায় সর্ব্বস্ব হারাল,—কিন্তু সে ছেড়ে দিয়ে ধ'রলে পাটের দালালি। দেখতে দেখতে সে আবার বড় লোক হ'ল। সর্ব্বস্ব পণ ক'রে জীবনের খেলায় এক বাজি হেরেই থাক, তবে সেই হারা-বাজির ঘুঁটিগুলো আঁকড়ে ধ'রে থেকে কিছু পাবে না। আর এক বাজী খেলতে হবে।"

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া হরিচরণ বলিল, "আর খেলবার সম্বল নেই ভাই আমার।"

১১

রমেশ অনেকক্ষণ আসিয়া বসিয়া ছিল। চুপ করিয়া সে অসীমের বক্তৃতা শুনিতেছিল—মুগ্ধ হইয়া সে শুনিতেছিল। অদ্ভুত লোক এই অসীম। তার গোটা জীবনটাই সৃষ্টিছাড়া। জীবনটাকে সে সত্য সত্যই একটা খেলার মত চালায়। মনের আনন্দের তার কখনও অভাব হয় না। যত বড় দুঃখই আসুক, সে হাসিমুখে তাকে বরণ করে। বন্ধুরা আশ্চর্য্য হইলে বলে, "তোমরা আশ্চর্য্য হ'চ্ছ ; কেন না, তোমরা শুধু এইটুকুই দেখছো, আর মনে হ'চ্ছে এটা একটা tragedy। কিন্তু আমি দেখছি, এটা বিশ্বব্যাপী farceএর একটা অধ্যায় মাত্র। তাই আমি কাঁদতে পারি না—হাসি।" আজ অসীম যে সব কথা বলিতেছিল, রমেশের মনে হইল সে সব অসীমের নিজের অদ্ভুত জীবনের ব্যাখ্যা।

অসীম মদ খায়—সে মাতাল নয়, কিন্তু মাঝে মাঝে মদ খায়। রমেশ একদিন তাকে বলিয়াছিলেন, "ও ছাই খাও কেন?" অসীম বলিল, "তোমরা জগতের সব জিনিসকে ভাল ও মন্দ দু'টো ভাগ ক'রে নিয়েছ। বাস্তবিক তোমাদের সে ভাগের কোনও মানে নেই। সেইটা প্রমাণ করবার জন্যে আমি তোমাদের মন্দ জিনিসগুলো সব ব্যবহার করি।"

অসীমের—যাকে চলিত কথায় ব'লে স্বভাব চরিত্র—মোটেই ভালো নয়। নারীর মন মাতাইবার তার আশ্চর্য্য শক্তি আছে। আর সেও নারীর মাধুরীতে সহজে মাতিয়া উঠে—বলে, প্রেমের চেয়ে বড় আনন্দ কি আছে? কিন্তু এক যায়গায় স্থির হইয়া থাকা তার স্বভাব নয় ; তাই তার প্রেমও বেশী দিন এক আধারে স্থায়ী হয় না। একটী মেয়ের সঙ্গে তার ভালবাসা বড় জমিয়া উঠিয়াছিল,—সবাই ভাবিল, বুঝি অসীম এতদিনে বাঁধা পড়িল। কিছুদিন বাদে সে সেই মেয়েটির চেহারা সম্বন্ধে এমন একটা স্পষ্ট কথা বলিয়া ফেলিল যে, সে নারী একেবারে বিমুখ হইয়া বসিল। সবাই অবাক হইয়া দেখিল, অসীম একটিবার তাকে সাধিল

না—সে ঠিক পূর্ব্বের মত হাসি মুখেই জীবন যাপন করিতে লাগিল। বন্ধুরা জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল, "আমার নগদ কারবার ভাই, বাকী বকেয়া রাখি না, Speculation করি না। চলতি ব্যবসার লাভ নি, লোকসান লোকসান বলেই ধরে নি। যতদিন ভালবাসা পেয়েছি নিয়েছি—এখন তা ফুরিয়ে গেছে—সে খতেনে শূন্য লিখে নূতন খাতা আরম্ভ করেছি।"

রমেশ আজ অসীমের মুখে তার অদ্ভুত জীবনের বিস্তারিত ব্যাখ্যা মোহাবিষ্টের মত শুনিল। যেমন অদ্ভুত অসীম, তেমনি অদ্ভুত তার জীবনতত্ত্ব! কথাগুলি মনকে চমক লাগাইয়া দেয়, মনের উপর একটা জোর টান দেয়।

অবশেষে রমেশের খেয়াল হইল, অসীমের কথাগুলি সত্য হোক, মিথ্যা হোক খুব স্পষ্ট স্পষ্ট। হরিচরণের মনের বর্ত্তমান অবস্থায় তার এই সব কথায় খুব সান্ত্বনা লাভ করিবার কথা নয়। তাই রমেশ বলিল, "অসীম দা' থাম। ওসব তত্ত্বকথা এখন তাকে তুলে রাখ। হরিদা, ভাই, আমার একটা কথা শুনবে? আমার সঙ্গে কিছুদিন বেড়াতে যাবে?"

হরিচরণ একবার বিশে'র মৃন্ময়ী-মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া বিষণ্ণ ভাবে ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "না ভাই, আমায় আর টানাটানি ক'রো না।"

অসীম বলিল, "কোথায় নিতে চাচ্ছ ওকে?"

"পাতিয়ালা।"

"পাতিয়ালা—সেখানে কি?"

"একটা চাকরী পেয়েছি দাদা।—বলা বাহুল্য, খেলার জোরে। কিন্তু চাকরীটা ভাল। আমি বলেছিলাম—হরিদা যদি সঙ্গে যেতো, তবে ওরও মনটা ভাল হ'ত, আমারও কয়েকটা দিন কাটতো।"

অসীম বলিল, "যাও না ভাই—গেলে ভাল হবে।"

হরিচরণের দু' চক্ষু বাহিয়া জল ঝরিতে লাগিল, "আমার আর ভাল কি ভাই? সব ভাল আমার ফুরিয়েছে!"

নার্স লতিকা তখন আসিয়া ঘরে ঢুকিল, সে সকলকে নমস্কার করিয়া আসিয়া হরিচরণের পাশে বসিল। কিছুক্ষণ কেউ কোনও কথা কহিল না। হরিচরণ নীরবে অশ্রু মুছিতে লাগিল—লতিকাও কোনও কথা বলিল না,

শুধু তার দুই চক্ষু দিয়া দরদর ধারে জল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। রমেশ মাথা নীচু করিয়া বসিয়া রহিল।

অসীম লতিকার মুখের দিকে মুগ্ধ নয়নে চাহিয়া রহিল—তার মনে হইল লতিকা মুর্ত্তিমতী করুণা।

অনেকক্ষণ পর চক্ষু মুছিয়া লতিকা বলিল, "দেখুন, উঠুন আপনি, একটু কিছু খান।"

হরিচরণ উঠিয়া বলিল, "আর কেন ব'লছেন নার্স? আর তো আমি না খেলে রোগশয্যায় পড়ে কেউ কেঁদে ভাসাবে না? তবে আর কেন?—আমি এখন খাব না।"

লতিকা আবার চক্ষু মুছিল। সে বলিল, "তিনি মুক্তি পেয়ে গেছেন, কিন্তু এ কথা ঠিক জানবেন হরিচরণবাবু, যে, আপনি যদি না খেয়ে কষ্ট পান, তবে পরলোকে ব'সেও, তিনি তেমনি কষ্ট পাবেন। আমি যে এখনও চোখে চোখে দেখ্‌তে পাচ্ছি—ছলছল চোখে তিনি ব'লছেন, "নার্স, উনি নিজে কিছু ক'রতে পারেন না, আপনি একবার তাঁকে দেখে যাবেন—তিনি হয় তো আমার জন্য ভেবে ভেবে খাওয়াদাওয়া ছেড়ে ব'সে আছেন।' আমি যখন বল্লাম, আমি আপনাকে খাইয়ে তবে ফিরবো, তবে বেচারা নিশ্চিন্ত হ'ল। আর রোজ দু'বেলা এ খবর তাঁর নেওয়াই চাই—এমনি ছিল তাঁর ভালবাসা। আজ তিনি মুখ ফুটে সে কথা ব'লতে পারছেন না ব'লে ভাববেন না যে তিনি এখনও ঠিক তেমনি মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা নিয়ে আপনার জন্য তেমনি ভেবে মরছেন না।'

হরিচরণ উঠিয়া বসিল, তার পর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া সে বলিল, "ও সব মিছে নার্স! পরলোক নেই—সে নেই—থাকলে সে আমায় দেখা না দিয়ে পারতো না। অসীম দা' যা ব'লেছে ঠিক—পরলোক নেই।"

লতিকা একবার তীব্রদৃষ্টিতে অসীমের দিকে চাহিয়া বলিল, "কি ব'লছেন উনি জানি না। কিন্তু আমি জানি—ওঁর কথা ভুল।" তারপর অসীমকে সে বলিল—

"আপনি কি ব'লেছেন তা জানি না। কিন্তু পরলোক যদি না থাকে, তবে মানুষ বেঁচে থাকে কিসের আশায়? কাজ করে, ভালোবাসে কিসের ভরসায়? মানুষের এত বড় ভরসাটাকে আপনি কেড়ে নিতে চান?

আপনি ভয়ানক লোক।" তার পর হরিচরণকে সে বলিল, "কিন্তু দেখুন, এটা তো সত্যি আপনার খাওয়া-দাওয়া, আরাম-যত্ন সম্বন্ধে আপনার স্ত্রীর ভাবনার অন্ত ছিল না। জীবনে আপনার সুখের চেয়ে বড় ইচ্ছে তাঁর ছিল না। সে ইচ্ছাটা আপনি তাঁর পূর্ণ ক'রবেন না, এই কি আপনার ভালবাসা? আর আপনি চান বা না চান আমি আপনাকে ছাড়বো না। তিনি আমায় এ ভার দিয়ে গেছেন,—আমি দেখছি, পরলোক থেকে তিনি আজও আমায় তেমনি ক'রে অনুরোধ করছেন। আমি তাঁর এ কাজ না ক'রে পারবো না।" লতিকার চক্ষু আবার সজল হইয়া উঠিল। "নিন উঠুন।" বলিয়া সে হরিচরণকে টানিয়া উঠাইল।

অসীম নীরবে উঠিয়া চলিয়া গেল। তার মুখরতা লতিকার সম্মুখে স্তব্ধ হইয়া গেল। লতিকার গভীর সহানুভূতি আর সহজ সেবা তার মনটা ভরিয়া ফেলিল।

হরিচরণকে যখন লতিকা জোর করিয়া স্নান করিতে পাঠাইল, তখন রমেশ তাকে অনুরোধ করিল যে, হরিচরণকে বুঝাইয়া পাতিয়ালা যাইতে সম্মত করিতে হইবে। লতিকা এ প্রস্তাব শুনিয়া সুখী হইল—সে বলিল, "আচ্ছা আমি দেখি।" বলিয়া সে হরিচরণের আহারের উদ্যোগ করিতে লাগিল।

হরিচরণের খাওয়া হইলে লতিকা বলিল, "যান না আপনি—বেড়িয়ে আসুন গে কিছুদিন পাতিয়ালায়!"

এইবার হরিচরণ একটু তীব্রকণ্ঠে বলিল, "কি ব'লছেন নার্স! এইখানে আমার স্ত্রী, দুঃখে কষ্টে অনাহারে অনেক কষ্ট পেয়ে মারা গেছে—আর আমি আজ আরাম ক'রে হাওয়া খেতে যাবো পাতিয়ালায়? আপনারা জানেন না; কত কষ্ট পেয়েছে সে আমার জন্য—আমি তাকে কত দুঃখ দিয়েছি। আমরা বড়লোক নই; কিন্তু দেশে আমাদের খাবার-পরবার অভাব ছিল না। একটা নিদারুণ অহঙ্কারে সে সব ফেলে এসেছিলাম আমি ক'লকাতায়—তাকে নিয়ে এসেছিলাম। নিজে তাকে একদিনও কিছু দিতে পারি নি, তার বড় আদরের গহনাগুলি একটি একটি ক'রে কেড়ে নিয়েছি, তবু তাকে দু'টো ভাল জিনিস একদিনের তরে খেতে দিতে পারি নি—তার ক্ষিদেই মিটাতে পারি নি। এমনি ক'রে তার সর্ব্বনাশ ক'রেছি

আমি!—আমি আজ যাব কলকাতা ছেড়ে আরাম ক'রতে?—মন ভাল ক'রতে? মন ভাল করবো কেন? তাকে যত দুঃখ দিয়েছি, সেই সব দুঃখ আগুনের মত হ'য়ে তিল তিল করে আমাকে পুড়িয়ে মারলে তবেই আমার শান্তি। সে সব ভুলবো? বলুন নার্স, আজ সে না ম'রে যদি আমি ম'রতাম, সে কি ভুলতে পারতো?" হরিচরণ আবার কাঁদিয়া ফেলিল।

লতিকা কথা বলিতে পারিল না। তারও বুক ঠেলিয়া কান্না পাইল। অনেকক্ষণ পর সে বলিল, "যা ব'ল্লেন ঠিক, কিন্তু একবার ভাবুন দেখি, সে যদি আজ এসে কথা বলতে পারতো, সে আপনাকে কি ব'লতো? ব'লতো না কি, যে এমনি ক'রে আমার কথা ভেবে যদি তুমি নিজেকে কষ্ট দাও, তবে আমি বাঁচবো কেমন করে? আজ সে এখানে নেই, কিন্তু পরলোক থেকে সে যে দেখে দেখে ঠিক এই কথাই বলছে।"

অনেকক্ষণ পীড়াপীড়ির পর হরিচরণ শেষে বলিল, "দেখুন, মাপ করুন, আমাকে অনুরোধ ক'রবেন না।"

লতিকা তখন বলিল, "আচ্ছা, আর একটা কথা বলি, আপনি যদি এমনি ক'রে নিজেকে মেরে ফেলেন, সে আমি দেখে কেমন ক'রে থাকবো? আমি তো ভুলতে পারি না—আপনার স্ত্রী আমাকে কত কাতর হ'য়ে ব'লেছিলেন আপনার দেখাশোনা ক'রতে। আমি তাকে কথা দিয়েছিলাম আমার যা সাধ্য করবো। সে কথা যদি রাখতে না পারি, তবে আমি শান্তি পাব কেমন ক'রে? আমার উপর কি আপনার একটু মায়া-দয়া নেই?"

হরিচরণ বলিল, "দেখুন, আপনি অমন ক'রে আমাকে অপরাধী ক'রবেন না। আপনি ছোট-বউর জন্য যা' ক'রেছেন, তাতে আপনার জন্য আমি প্রাণ দিলেও আমার দেনা শোধ হবে না।"

"তবে আমার অনুরোধেই এ কথাটা রাখুন।"

অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া হরিচরণ বলিল, "আচ্ছা বেশ, আপনার যদি সেই আদেশই হয়, তাতেই যদি আপনার মন খুসী হয়, তাই হোক!" বলিয়া সে মুখ ফিরাইল—তার চোখ পড়িল বিশে'র মৃন্ময়ী মূর্ত্তির উপর—সে থমকিয়া গেল। তার পর বলিল, "দেখুন, এ অনুরোধ আমায় ক'রবেন না। আমি যেতে পারবো না। ছোট-বউর এ মূর্ত্তি—এই আমার এখন

সব। আমি তাকে সামনে বসিয়ে এটা গ'ড়েছিলাম- সে তিল তিল ক'রে এই মূর্ত্তির ভিতর তার সমস্ত প্রাণটা বসিয়ে দিয়ে গেছে, এর যত্ন ক'রে— একে আমি কোথায় রেখে যাব- কে এর যত্ন ক'রবে ?"

লতিকা বলিল, "আমার কাছে রেখে যান, একে আমি মন্দিরে প্রতিমার মত যত্ন ক'রে রাখবো। আর আপনি ফিরে এলেই আপনার কাছে পৌঁছে দেব।—এর জন্য কোনও ভাবনা ক'রবেন না"

তাই স্থির হইল। দুই দিন পর হরিচরণ পাতিয়ালা যাত্রা করিল।

১২

অসীম লতিকার কাছে আসিয়াছিল।

সেই দিন হইতে সে প্রায় আসে—যতক্ষণ পারে, বসে, গল্পস্বল্প করে, চলিয়া যায়।

বন্ধুরা জানে, অসীম এখানে একটা নূতন টোপ ফেলিয়াছে। লতিকাকে লইয়া তারা ঠাট্টা তামাসা করে।

অসীম হাসিয়া বলিল, "কি জানি ভাই, টোপ ফেলেছি কি গিলেছি বুঝতে পারছি না।"

বন্ধুরা বলে, "এমন আজগুবী কথা শুনেছে কেউ কখনও?"

অসীম বলে, "রোজই এই আজগুবী কাণ্ড হ'চ্ছে—পুকুরের ধারে নয়, সংসারে। হামেশাই দেখতে পাই, দু'টো প্রাণ একটা স্থতো দিয়ে জোড়া র'য়েছে—কে যে কাকে গেঁথেছে ঠিক বোঝা যায় না, যতক্ষণ না—যতক্ষণ না একটা হেঁচকা টান পড়ে। আর টানটা প'ড়লে অনেক সময়েই দেখা যায়—দু'দিকেই বড়শী বিঁধেছে।"

মেয়েমানুষ সম্বন্ধে অসীমের কোনও কথা কেউ ঠিক বিশ্বাস করে না, এখানেও করিল না।

অসীম প্রায়ই আসে। আসিয়া সে তার অভ্যাস মত গল্প বলে, লতিকা হাসিয়া গড়াগড়ি যায়।

লতিকা বলে, "আপনি বড় রস দিয়ে কথা ব'লতে পারেন। বাস্তবিক আপনার কথাগুলো এত অদ্ভুত যে শুনতে ভারী ভাল লাগে।"

এ কথায় অসীম যেন আরও উৎসাহিত হইয়া তার কথায় রস ঢালিয়া দিবার জন্য চেষ্টা করে। এইখানেই অসীমের ব্যবহারের একটু অস্বাভাবিকতা। সে সবার কাছেই এমন সব কথা বলে, যা সবার অদ্ভুত লাগে; আর বিষয় যতই গুরুতর হউক তাকে সে হাল্কা করিয়া তার উপর হাসির পালিশ লাগাইয়া দেয়। ইহা তার স্বভাব—সে কোনও দিন চেষ্টা

করিয়া এমন করে না। কিন্তু লতিকার কাছে সে তার কথাগুলিকে ঝক্‌ঝকে করিবার জন্য একটু বিশেষ চেষ্টা করে, লতিকার মুখে হাসি ফুটাইবার জন্য একটু বিশিষ্ট আয়োজন করে।

কেন?

লতিকা সুন্দরী নয়—কালো তার রং, যদিও বেশ গোলগাল চেহারা, আর মুখখানির ভিতর যথেষ্ট লাবণ্য আছে। এমনও নয় যে, লতিকা অসাধারণ বুদ্ধিমতী। অসীম তাকে টোকা দিয়া দেখিয়াছে,—সে দু'দিনেই বুঝিয়াছে, লতিকার খুব পড়াশুনাও নাই, বুদ্ধিও খুব তীক্ষ্ণ নয়। সে এমন সব কথা বলে, এমন কাজ অনেক সময় করে, যা কোনও বুদ্ধিমতী মেয়ে একজন অপর পুরুষের সামনে বলে না বা করে না। অনেক সময় তার কথায় ও কাজে মাজা-ঘষার অভাব দেখা যায়।

তবু অসীম লতিকাকে খুসী করিবার জন্য বেশ একটু চেষ্টা করে। লতিকার হাসিটি বেশ মিষ্টি, কিন্তু এমন কিছু ভয়ানক সুন্দর নয়। কিন্তু সেই হাসি দেখিবার জন্য অসীমের যেন বেশ একটু আকাঙ্ক্ষা আছে—তাই সে তাকে হাসায়।

প্রথমে লতিকার কাছে সে যেদিন আসিল, সেদিন লতিকা তাকে সহজ শিষ্টতার বর্ম্ম পরিয়া সম্ভাষণ করিয়াছিল। অসীম কথা পাড়িয়াছিল হরিচরণ ও তার স্ত্রীর। সেই কথায় লতিকা একেবারে গলিয়া গেল। তাদের কথা বলিতে বলিতে বার বার লতিকা চক্ষু মুছিল। এটা অসীমের বড় ভাল লাগিল।

তার পরই অসীম চট্ করিয়া বলিল, "আপনি ভালবেসেছেন কাউকে?"

লতিকা 'হাঁ' বা 'না' কিছু বলিল না। সে একটু লাল হইয়া উঠিল।

অসীম বলিল, "দেখুন, আমার পরামর্শ যদি শোনেন, তবে ওদের মত ক'রে ভালবাসবেন না, ওতে সুখ নেই।"

"কিন্তু সুখের ওজন ক'রে কি ভালবাসা যায় অসীমবাবু?"

"সবাই পারে না,--যার তত্ত্বজ্ঞান হ'য়েছে সে পারে। সে জানে—ভালবাসা একটা ক্ষণিকের ব্যাপার—যতদিন আছে, তার ভিতর থেকে যতটা সুখ আদায় ক'রতে পারা যায়, ক'রতে হ'বে। তার পর সব চুকে গেলে একে ছুঁড়ে ফেলে দিতে হ'বে।"

লতিকা যেন চমকাইয়া উঠিল—সে বলিল, "কি ভয়ানক লোক আপনি! আপনার কথার সোজা মানে এই যে, ভালবাসায় আপনার বিশ্বাস নেই।"

অসীম হাসিয়া বলিল, "তা নয়। এর মানে এই যে, ভালবাসার খাঁটি আদর শুধু আমিই জানি।"

এমনি করিয়া লতিকাকে কেবল ধাক্কা দিতে দিতে অসীম তার শিষ্টতার বর্ম্ম খুলিয়া ফেলিল। ক্রমে লতিকা তার কাছে সম্পূর্ণ সহজ মানুষ হইয়া প্রকাশ পাইল।

তখন অসীম দেখিল, লতিকা একটি কাদার মত মানুষ। তাকে অসীম ইচ্ছা করিলে যে ছাঁচে ইচ্ছা সেই ছাঁচে ঢালিতে পারে। তার কোনও ধরা-বাঁধা বিশ্বাস নাই,—মতামতের কোনও এমন বিশেষ দৃঢ়তা নাই, যাতে অসীমের পক্ষে তার মত বদলান কঠিন।

কিন্তু এ কথা সম্পূর্ণ বুঝিয়াও অসীম সেই কাদার মানুষকে নিজের মনের মত করিয়া গড়িবার কোনও বিশেষ চেষ্টাই করিল না। সে ঠিক যেমন তেমনিই তাকে অসীমের ভাল লাগিল,—তাই সে লতিকাকে মেরামত করিয়া লইবার কোনও চেষ্টা করিল না। এমন কি ভালবাসার প্রকৃতি সম্বন্ধে লতিকার মত বদলাইবারও সে কোনও চেষ্টা করিল না।

তার পর হইতে অসীম শুধু এমনি সব কথা বলে, যার সঙ্গে তাদের দু'জনের জীবনের কোনও সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই। আর সেই সব কথা সে যত্ন করিয়া বাছিয়া ব্যবহার করে, যাতে লতিকার মনে তার কথার অদ্ভুতত্বে একটা ধাক্কাও লাগে, আবার হাসিও পায়!

একদিন সে বলিল, "সত্যি কথা বলা একটা বাতিক বিশেষ। এক একজনের যেমন শুচিবাই থাকে, তেমনি এক একজনের মিথ্যা কথা বিষয়ে শুচিবাই আছে।"

লতিকা বলিল, "সে কি? সত্যি কথা বলবে না লোকে!"

"বলুক তাতে আমার মানা নেই,—সত্যি কোনও জিনিসেই আমার আপত্তি নেই। কিন্তু তাই ব'লে মিথ্যে বল্লেই জাত যাবে, এ কেমন কথা? কেবল নিছক সত্যবাদীদের নিয়ে যদি পৃথিবী চলতো, তবে কি ভয়ানক অসহ্য হ'য়ে উঠতো পৃথিবীটা? মিথ্যেটা হ'চ্ছে চাটনী, সেটা আছে ব'লেই সত্যির ভিতর রস আছে।"

"তবে আপনি বোধহয় কখনই সত্য কথা বলেন না ?"

"বলি ; না বল্লে তো চলে না। ক্ষিদে হ'য়েছে, খেতে ব'সেছি, ঠাকুর জিজ্ঞাসা ক'রলে 'ভাত চাই কি ?' সেখানে যদি মিথ্যা ক'রে বলি 'না চাই না', তবে, মেসে থাকি আমরা, আমাদের যে উপোস ক'রে থাকতে হ'ত। অথচ এটা যদি মেস না হ'য়ে শ্বশুরবাড়ী হ'ত, তাহ'লে আমি 'না'ও ব'লতাম, পেট ভ'রে খেতেও পেতাম। শাশুড়ী ঠাকরুণ না খাইয়ে ছাড়তেন না। সেখানে মিথ্যে বলা যে শুধু চলে তাই নয়, তাই আমাদের শিষ্টাচার। নইলে শ্বশুরবাড়ী গিয়ে জামাই যদি সত্যি ক'রে বলে 'ক্ষিদে পেয়েছে, আমায় খেতে দাও' অমনি সবাই তাকে ছি ছি ক'রে বলবে, জামাই কি বেহায়া।"

"যাহ'ক, আপনি মিথ্যে বলেন মাঝে মাঝে ?"

"হাঁ, অনেক সময় বলি। এই ধরুন, কাল আপনি জিগ্‌গেস ক'রলেন —আমি খেয়ে এসেছি কি না ?—আমি বল্লাম—হাঁ। যদি সত্য কথা ব'লতাম, তবে আপনি হয় তো এখানে আমাকে খেতে ব'লতেন। সেটা আমার ইচ্ছা ছিল না। কাজেই আপনার অনুরোধ এবং আমার সেটা কাটান, এই নিয়ে অনেকটা বাজে সময় কেটে যেত।"

"কি অদ্ভুত লোক আপনি।"

"কিন্তু কথাটা যা বল্লাম সেটা ঠিক। কেমন ?"

"সেই রকম তো ঠেকছে—কিন্তু মানতে ইচ্ছে করে না।"

"ওই তো গোল। সত্যি কথা বলতে হবে ব'লে ব'লে লোকে এমন একটা আবহাওয়া তৈরী ক'রেছে যে, সেটা না মানলেও, মানছি না ব'লতে লোকে চায় না। পৃথিবীতে যত রকম অত্যাচার আছে, তার ভিতর এই সত্যবাদীদের অত্যাচারটা সব চেয়ে বেশী। আমার এত রাগ হয় যে, অনেক দিন ইচ্ছা হ'য়েছে যে, একটা মিথ্যাবাদী সমাজ তৈরী করি।

"ওমা, কি অদ্ভুত খেয়াল ?" বলিয়া লতিকা হাসিল।

"আমি কথাটা অনেক ভেবে দেখেছি, বেশ চলে। মনে করুন, আমরা দশজন কি বিশজন যে সমাজের সভ্য হ'লাম। আমাদের নিয়ম রইলো আমরা কখনও পরস্পরের কাছে সত্যি কথা বলবো না, সব সময়ই মিথ্যা বলবো। তাহ'লে কি মজা হয় ভাবুন তো ?"

"ওমা, তাহ'লে চলবে কি ক'রে? তাহ'লে সে সমাজের সভ্যদের মধ্যে কেউ কারো মনের কথা জানতে পারবে না,"—

"কত বড় সুবিধে বলুন তো। মনের কথা, গোপন জিনিস,—সেটা লোকের কাছে প্রকাশ হ'য়ে যাওয়াটা কি ভাল?"

এমন গম্ভীর ভাবে অসীম কথাটা বলিল, যে লতিকা হাসিয়া গড়াইয়া পড়িল। সে বলিল, "কিন্তু এমন কতকগুলি মনের কথা তো আছে, যা পরস্পরের কাছে প্রকাশ হওয়া দরকার। তাও তো জানা যাবে না। আমি যদি আপনাকে বলি, কাছে আসুন, তখন বুঝতে হবে, যে দূরে যান'—

"সে তো এখনও হ'চ্ছে। বরং এখন সত্য ও মিথ্যার ভেজাল হ'য়ে মনের কথা জানাটা ভয়ানক কঠিন হ'য়ে দাঁড়াচ্ছে। আপনি যাকে খুব ভালবাসেন, তাকে বল্লেন, "তুমি চ'লে যাও, আর আমার কাছে এসো না।' তখন সে বেচারা মুস্কিলে প'ড়ে যাবে,—ঠিক বুঝতে পারবে না যে, তার চ'লে যাওয়াটাই আপনার ইচ্ছা, না তার উল্টাটা। আমাদের মিথ্যাবাদী সমাজে সেখানে কোনও মুস্কিলই হবে না। সে তখনি চট ক'রে এসে আপনার কোল জুড়ে ব'সবে।"

"তবে আর লাভ কি হ'ল আপনার? সবার সব মনের কথা ঠিক বোঝাই যদি গেল, তবে আর মিথ্যের মানে রইলো কি? তখন যে আপনারা আমাদের মত সত্যবাদীর চেয়ে বেশী সত্যবাদী হ'য়ে উঠবেন।"

"কিন্তু তা' হবে না। সব সময় যা ব'ল্লাম সেটা মিথ্যে হ'লেই সে সত্যি কথাটা বোঝাই যাবে তা হবে না। মনে করুন, আমি বল্লাম ইলিস মাছ খাব—আপনি বুঝলেন কথাটা মিথ্যে,—কিন্তু আমি মাছ খাব, না মাংস খাব, না ছানা খাব—কিছু বোঝা যাবে না। এইখানেই এর মজা।"

এ ব্যাপারটা লতিকার কাছে ভারী কৌতুকের বলিয়া মনে হইল। সে বলিল, "তা বটে,—আমি তো ভেবেই পাচ্ছি না, তা' হ'লে আপনাদের কেমন ক'রে চলবে।"

"আমার বিশ্বাস, চলবে ঠিক সমস্ত পৃথিবী যেমন ভাবে চলছে তেমনি। কেন না, আমরা কেউই কারও কথা ঠিক বিশ্বাস করি না। ধ'রেই নি—সবাই কিছু কিছু মিথ্যা ব'লছে। তার পর তার উদ্দেশ্যটা আঁচ ক'রে নিজের বুদ্ধিমত কাজ করি। মিথ্যা মিলনীতে তাই ক'রতে হবে।"

"এমন সব অদ্ভুত খেয়ালও আপনার মাথায় আসে। হাঁ—তা আপনার সমাজ কি আরম্ভ হ'য়ে গেছে?"

"না, হবার জো কি? মেম্বারই পাওয়া যাচ্ছে না। যারা সব নাম-জাদা মিথ্যাবাদী, তাদের সবাইকে জিজ্ঞাসা ক'রে দেখেছি—কেউ রাজী নয়—বলে 'ওরে বাপ রে! ভাবটা এই যে, মিথ্যা কথা বলতে তারা যদিও সর্ব্বদাই রাজী, তবু খাতায় নাম লিখিয়ে তারা মিথ্যেবাদী হ'তে রাজী নয়। ধরতে গেলে তারা ঠিকই ক'রছে; কেন না, তা' হ'লে সেইখানেই তো তাদের একটা সত্যি কথা বল্‌তে হয়!"

"তা' মিথ্যাবাদীদের ছেড়ে একবার সত্যবাদীদের ধ'রে দেখুন না,— তারা হয় তো রাজী হ'তে পারে।"

"ওরে বাপ রে! তারা কেবল মারতে বাকী রাখে। সত্যবাদী জাতটার sense of humour বড় নেই কি না?"

"কেন? এতে তাঁদের চটবার কি আছে—একটা মজা করা বই তো নয়? আমি মেম্বার হ'তে রাজী আছি!"

অসীম হাসিল। লতিকাকে সে যে অনায়াসে সব করিতে রাজী করাইতে পারে, তার এই কথা তার একটা সামান্য নিদর্শন। এমন পরিচয় সে অনেক পাইয়াছে।

এমনি করিয়া তাদের ভিতর ঘনিষ্ঠতা বাড়িয়া চলিল।

তাদের প্রথম সাক্ষাতের পর ছয় মাস চলিয়া গিয়াছে, আজও অসীম আসিয়াছে।

অসীম বলিল, "আপনারা যে ভাল মন্দ এই দু'টোকে দাগ কেটে তফাৎ ক'রে দেন, এর কোনও মানে নেই। অমুক কাজ ভাল, অমুক কাজ মন্দ, অমুক লোক ভাল, অমুক মন্দ—এ কোনও কাজের কথাই নয়। সবই ভালো, সবই মন্দ।"

"ওমা, বলেন কি? ভাল মন্দ নেই—চুরি, ডাকাতি, দান ধ্যান সবই এক?"

"অনেকটা নয় কি? চুরী করা কি সব সময়ই মন্দ? ধরুন—আমি আপনাকে গোপনে ভালবাসি। আপনার একখানা ছবি পাবার আমার বড় ইচ্ছা। অথচ তা পাবার উপায় আমার নেই। আমি যদি সে স্থলে

একখানা ছবি চুরি ক'রেই নি—সেটা কি খারাপ? তবে ভালবাসাও খারাপ?"

লতিকা বলিল, "এ বুঝি চুরি হ'ল?"

"নয় কেন? ছবিখানার দাম তুচ্ছ ব'লে? আচ্ছা ধরুন, যদি ঠিক এই কারণে আমি আপনার হীরার আংটীটাই চুরি করি।"

"তবু, এ কথা আলাদা, এর মধ্যে কোনও খারাপ উদ্দেশ্য তো নেই।"

"তা' হ'লেই তো হ'ল, কোনও কিছুই অমনি ছাপ মেরে ভাল বা মন্দ বলা যায় না—সেটা ভাল না মন্দ সেটা নির্ভর করে অনেকগুলো অবস্থার উপর। এই ধরুন আমি মদ খাই"—

"তাই না কি?" লতিকা একটু চমকাইয়া উঠিল।

হাসিয়া অসীম বলিল, "পৃথিবীর বার আনা লোক অমনি আপনারই মত চমকে ওঠে। কিন্তু এত দোষ কি?"

"দোষ নেই? মদ খাওয়া! বলেন কি আপনি? দেখুন, আপনি আর খাবেন না।"

"অথচ, আপনি নিজে হাতে লোককে মদ খাইয়েছেন!"

উত্তপ্ত ভাবে লতিকা বলিল, "কখনও না,—এ কথা আপনাকে যে ব'লেছে সে মিথ্যাবাদী! আমি কখনও মদ খেতে দি'নি। লোকে যদি খায়, তবে আমি কি ক'রবো?"

হাসিয়া অসীম বলিল, "একজনকে আপনি অন্ততঃ প্রায় দু-বোতল ব্রাণ্ডি খাইয়েছেন—ধরুন হরির স্ত্রীকে।"

লতিকার মন হইতে যেন একটা বোঝা নামিয়া গেল, সে বলিল, "ও—সেই কথা ব'লছেন। সে তো ওষুধ।"

"কিন্তু জিনিসটা মদ।"

"কিন্তু আপনি তো আর ওষুধ ব'লে খান না,—মাতাল হওয়ার জন্য খান।"

"আপনি ভুল ক'রলেন,—ওষুধ ব'লে খাইনে ঠিক, কিন্তু মাতাল আমি কোনও দিন হইনি। হোক, ধরুন আমি মাতালই হই, তাতে কার কি ক্ষতি? আমি আমার নিজের ঘরে ব'সে যদি খানিকটা আবোল তাবোল বকি কিম্বা পাগলের মত কাজ করি, যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমি কারও অনিষ্ট না করি ততক্ষণ তাতে দোষ কি?"

"কিন্তু অমনি ক'রে আপনি আপনার নিজের সর্ব্বনাশ ক'রচেন।"

"তাতেই বা কি? আচ্ছা ধরলাম তাতে ক্ষতি আছে-মেনে নিলাম যে মাতাল যদি আমি হই, তবে সেটা খারাপ—কিন্তু মাতাল না হই যদি, যদি মদ খেয়ে একটু শুধু বেশী স্ফূর্ত্তি পাই, একটু বেশী কাজ ক'রতে পারি—মাথায় অনেক কথা খেলে যায়—তবে?"

"তবেও খারাপ—মনকে বিশ্বাস নেই--এমন বেশী দিন চলে না। আমি নিজ চক্ষে দেখেছি।"

"তা হ'লেও আপনি এটা স্বীকার ক'রছেন, যে মদ খাওয়াটাই দোষের নয়, কেন না, ওষুধ ক'রে তাকে খাওয়া যেতে পারে। সেটা দোষের হয় অবস্থা অনুসারে।"

"তা কে অস্বীকার ক'রছে?"

"এমনি সব জিনিস। সব সময় ভাল বা সব সময় মন্দ নেই। মার্কা মারা ভাল-মন্দ-বিচার মানুষের একটা জবরদস্তী বই কিছুই নয়। আর এ জবরদস্তী সব চেয়ে বেশী দেখা যায় সেইখানে, সেখানে একটা লোককে ভাল বা মন্দ ব'লে মার্কা মেরে দেওয়া হয়। অথচ, ছাপ-মারা ভাল বা মন্দ জগতে নেই। অনেক চোর আছে যারা স্ত্রী-পুত্রকে ভয়ানক ভালবাসে, হয় তো তারা লোকের দুঃখে কষ্টে প্রাণ দিয়ে খাটে—তারা ভাল না মন্দ।"

"তবু ভালো-লোক আর মন্দ-লোকের তফাৎ আছে।"

"আছে কি? আচ্ছা ধরুন আপনি নিজে—আপনি, নিশ্চয় ভালো-লোক।"

"আহা, আমি কি আমার নিজের কথা বলছি।"

"আপনি না বলুন আমি বলবো। আপনার মত ভাল-লোক আমি খুব বেশী দেখিনি। আজ হরি যদি এখানে থাকতো, সে এই কথা আরও জোর গলায় ব'লতো।"

সলজ্জ হাসি হাসিয়া লতিকা বলিল, "যান, আপনি কি যে বলেন! এ বুঝি আপনার মিথ্যা-মিলনী পেয়েছেন?"

"না, আমি সত্যি কথাই বলছি। বরং আপনিই শিষ্টাচার নামক মিথ্যাবাদী সমাজের নিয়মে কথাটা অস্বীকার ক'রছেন—অথচ, মনে মনে আপনি নিশ্চয়ই জানেন, আপনি ভাল-লোক।"

"যান, আপনি বড় দুষ্টু। লোককে বড় লজ্জা দিতে পারেন। ছি!"

"আচ্ছা আপনি ভালো-লোক, অথচ দেখুন আপনার দোষও আছে—লোকের চক্ষে খুব বড় দোষ—আপনার স্বভাব-চরিত্র ভাল নয়।"

লতিকা এ কথার স্পর্দ্ধায় নির্ব্বাক হইয়া গেল। ক্রোধে অন্ধ হইয়া সে অসীমের দিকে শুধু কটমট দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

অসীম শান্তভাবে বলিয়া গেল, "আপনি বিয়ে করেন নি, অথচ পুরুষের সংসর্গ আপনার অজানা নয়।"

লতিকা দাঁড়াইয়া উঠিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল, "মিথ্যে কথা! কে বল্লে আপনাকে?"

শান্তভাবে অসীম বলিল, "কেন? আপনি নিজেই তো স্বীকার ক'রলেন, সে ভদ্রলোক মদ খান, কিন্তু আপনি খেতে দেন না।"

লতিকা বলিল, "বেশ! তাতে আপনার কি?"

হাসিয়া অসীম বলিল, "কিছুই না—তাতে আপনাকে আমি ভাল ব'লতে ছাড়বো না—শুধু এই কথা।—কাজেই—

"আপনি কি সাহসে আমার ঘরে ব'সে ব'সে আমাকে অপমান ক'রছেন বলুন তো?"

"অপমান? কই?"—

"যান আর বিনিয়ে বিনিয়ে কথা ব'লতে হবে না। আপনি যান চলে—উঠুন—চ'লে যান।"

অসীম উঠিল না, কিন্তু চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

লতিকা রাগ করিয়া সে ঘর হইতে অন্য ঘরে চলিয়া গেল।

অসীম অনেকক্ষণ বসিয়া বসিয়া ভাবিল। বর্ত্তমানবাদী অসীম ভাবিল! আরও অনেক নারী তাকে এমনি বিদায় করিয়াছে, তাতে সে ভাবে নাই। আজ ভাবিল।

অন্য স্থানে অসীম শুধু তল্পীতল্পা গুটাইয়া সে অঞ্চলের কারবার উঠাইয়া চলিয়া আসিয়াছে—মনের ভিতর ব্যথার আঁচড়টিও তার পড়িতে পারে নাই। কিন্তু আজ তার মনে ব্যথা লাগিল। এখানকার কারবার গুটাইতে তার ইচ্ছা হইল না।

তার চোখের সামনে কেবলই ভাসিয়া উঠিল, হরিচরণের শিয়রে বসা করুণাময়ী লতিকার মূর্ত্তি—সে মূর্ত্তি সে একদিনের তরেও মনের চিত্রপট হইতে মুছিতে পারে নাই। সে ব্যথিত হইয়া উঠিল।

অনেকক্ষণ ভাবিয়া ভাবিয়া সে চলিয়া গেল।

১৩

ছয় মাস পরে হরিচরণ কলিকাতায় ফিরিল।

তার চেহারা ফিরিয়াছে, কিন্তু অদৃষ্ট ফিরে নাই। পাতিয়ালায় সে কয়েকখানা বড়লোকের ছবি আঁকিয়া কিছু টাকা পাইয়াছিল—সে টাকা সে সেখানেই খরচ করিয়া আসিয়াছে। যা কিছু অবশিষ্ট ছিল, সে ফিরিবার পথে দিল্লী, আগ্রা, জয়পুর, লক্ষ্ণৌ, কাশী প্রভৃতি স্থানে ঘুরিয়া যেখানে যা কিছু সুন্দর দেখিয়াছে, সব কিনিয়া খরচ করিয়া ফিরিয়াছে।

কলিকাতায় ফিরিয়া সে প্রথমেই মাল সুদ্ধ গাড়ী লইয়া গেল লতিকার কাছে।

লতিকা তখন হাসপাতাল হইতে ফিরিয়া সবে খাবার আয়োজন করিতেছে। একখানা আধময়লা কাপড় পরিয়া সে উনুনে ভাত চড়াইয়া তখন তরকারী কুটিতে বসিয়াছে।

হরিচরণ ডাকিল, "নার্স বাড়ী আছেন ?"

লতিকা যেন চমকাইয়া উঠিল। সে তড়াক্ করিয়া উঠিয়া বলিল, "কে ?"

হরিচরণ বলিল, "আমি হরিচরণ।"

ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া লতিকা ছুটিল তার ঘরের দিকে—তার পর ফিরিয়া হাঁকিল, "একটু দাঁড়ান, আমি দোর খুলছি।"

সে তাড়াতাড়ি কাপড় ছাড়িয়া ভাল কাপড়চোপড় পড়িল। আরসী ধরিয়া চুলটা একটু ফিরাইল, মুখটা একবার মুছিল। তার পর ছুটিয়া গিয়া দুয়ার খুলিল। হরিচরণকে দেখিয়া তার মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

সে ত্রস্তে-ব্যস্তে হরিচরণকে ভিতরে বসাইয়া বলিল, "কবে এলেন ?"

হরিচরণ হাসিয়া বলিল, "এই মাত্র, এখনো আসা শেষ হয় নি, ষ্টেশন থেকেই এখানে আসছি।"

লতিকা এ কথায় অযথা উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। সে বলিল, "ওঃ, একেবারে সোজা এইখানে—কি ভাগ্যি আমার। একটু চা ক'রে দেব ?"

"না, থাক। চা' আমি বেশী খাইনে ; তা' আপনি ভাল আছেন ?"

"হাঁ।—আপনার ভারী উপকার হ'য়েছে কিন্তু,—কি সুন্দর যে দেখাচ্ছে আপনাকে !"

হরিচরণ হাসিয়া বলিল, "আমাকে সুন্দর দেখাতে পারে এ শুধু আপনি বল্লেন—আর—সে ব'লতো।" বলিয়া হরিচরণ একটা ছোট্ট দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল।

লতিকা ভারি লজ্জিত হইল—লজ্জায় সে হাসিল।

একটু পরে হরিচরণ বলিল, "যাবার পথেই এলাম, ভাবলাম, গাড়ী তো হামেশাই আমি চড়ি না, একেবারে মূর্ত্তিটা নিয়ে যাই।"

লতিকা একটু অপ্রসন্ন হইল। সে যাহা ভাবিয়াছিল, তাহা তবে নয়। লতিকার সঙ্গে দেখা করিবার জন্যই হরিচরণ ষ্টেশন হইতে আসে নাই, আসিয়াছে বিশে'র ওই মাটির মূর্ত্তির জন্য। একটা মাটির মূর্ত্তির কাছে এমনি খেলো হইয়া গিয়া সে যেন একটু অতৃপ্তি বোধ করিল।

সে বলিস, "ও, তাই,—আমি ভেবেছিলাম বুঝি আমার সঙ্গে দেখা ক'রতেই এসেছেন।"

হরিচরণ হাসিয়া বলিল, "রথ দেখতে এসেছি ব'লে যে কলা বেচবার কথা ভাবিনি এ কথা কেন মনে ক'রছেন ?"

"তা কোথায় যাবেন এখন, বাসা ঠিক ক'রেছেন ?"

"না—এখন অসীমদের মেসে যাব ভাবছি—তার পর একটা আস্তানা ঠিক করা যাবে। অসীমের মেসে থাকবো এতটা সঙ্গতি তো আমার নেই।"

একটু ইতস্ততঃ করিয়া লতিকা বলিল, "তা যতদিন একটা ঠিক না হয় ততদিন এখানেই থাকুন না ?" এ কথা বলিতে লতিকা লজ্জায় অযথা লাল হইয়া উঠিল।

হরিচরণ বলিল. "না, না, আপনাকে আর অসুবিধায় ফেলতে চাই নে।—অসীমের ওখানেই ক'দিন থাকা যাবে।"

"কেন ? অসীমবাবু আপনার বন্ধু, আর আমি কেউ না—কেমন ?"

গম্ভীর ভাবে হরিচরণ বলিল, "আপনি আমার কত বড় বন্ধু তা জানেন শুধু ভগবান। গরীব অসহায় আমি, আপনি আমার না ক'রেছেন কি ?

আপনি ভুল বুঝবেন না, দয়া ক'রে। আমি আপনার এখানে থাকতে চাই না, তা' শুধু এই কারণে যে, আপনার এত দয়ার পর আর আপনাকে ভারাক্রান্ত ক'রতে চাই নে।"

"কিন্তু আমি যদি না ছাড়ি—আমি যদি ঐ মূর্ত্তি আপনাকে নিতে না দি ?" বলিয়া লতিকা একটু দুষ্টু হাসি হাসিল।

হরিচরণ অবাক্ হইয়া কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিল। তার পর বলিল, "কেন আপনি এ অভাগার বোঝা ঘাড়ে টেনে নিচ্ছেন বলুন। আপনি জানেন না আমি কত বড় অভাগা। আমার সংস্পর্শে হয় তো আপনারও অমঙ্গল হ'তে পারে! আমায় ছেড়ে দিন।"

"হয় হোক" বলিয়া লতিকা কোচোয়ানকে মাল নামাইতে বলিল।

হরিচরণ মিনতি করিয়া বলিল, "দেখুন, আপনি আমাকে বড় লজ্জা দিচ্ছেন, আমাকে"—

লতিকা বলিল, "বেশ তো—না হয় যাবেনই। এখন এখানে স্নান ক'রে খেয়ে নিতে তো কোনও বাধা নেই।"

হরিচরণ বাধ্য হইয়া সেখানেই রহিয়া গেল।

লতিকার বাড়ীতে তিনটী ঘর। বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, ছিমছাম। আসবাবপত্রও যা আছে বেশ সুন্দর। সে তাড়াতাড়ি একটা ঘর হইতে জিনিষপত্র নাড়াচাড়া করিয়া হরিচরণের বাসের যোগ্য করিয়া ফেলিল। তার পর সে ছুটিয়া রান্না করিতে গেল। হরিচরণের নাওয়া-খাওয়া হইয়া গেলে, সে তার বিছানা পাতিয়া তাকে একটু শুইতে বলিল। নিজে সে বাহিরে চলিয়া গেল।

অসীমের মেসের কাছে গিয়া সে ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। মেসে ঢুকিয়া অসীমের সন্ধান করিতে সে সঙ্কুচিত হইল; সে রাস্তার অপর পাশে দাঁড়াইয়া পায়চারী করিতে লাগিল।

হঠাৎ তার সামনেই অসীম আসিয়া উপস্থিত হইল—সে বাড়ী ছিল না, এতক্ষণে ফিরিতেছে। লতিকাকে দেখিয়া সে হাসিমুখে তাকে সম্ভাষণ করিয়া বলিল, "এই যে—আপনি এখানে ?"

লতিকা চাহিয়া ছিল মেসের দিকে—সে হঠাৎ এই সম্ভাষণে চমকিত হইল। তার পর অসীমকে দেখিয়া খুসী হইল।

লতিকা একটু বিব্রত ভাবে বলিল, "হরিবাবু এসেছেন—তাই আপনাকে খবর দিতে এসেছি।"

"ওঃ, হরিচরণ দেখি ভারী বড়মানুষ হ'য়ে এসেছে,—আপনি না এসে খবর পাঠিয়েছে আপনাকে দিয়ে?"

"না, না, তিনি পাঠান নি, আমি এই পথে যাচ্ছিলাম, ভাবলাম আপনাকে খবর দিয়ে যাই।"

অসীম এমন কৌতূহলী দৃষ্টিতে লতিকার দিকে চাহিল যে লতিকা লজ্জিত হইয়া উঠিল।

অসীম জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় আছে সে?"

লতিকা একটু থতমত খাইয়া বলিল, "আমার ওখানেই রেখেছি তাকে আপাততঃ।"

অসীম বলিল, "ও!"—বলিয়া একটু হাসিল।

লতিকা আরও বিব্রত ও লজ্জিত হইয়া বলিল, "যা ভাবছেন তা নয়।"

"আমি কি ভাবছি তা' আপনাকে কে বল্লে?"

"সে বুঝতে পারি।"

"কি বুঝেছেন বলুন দিকিনি।"

"না—সে আমি ব'লতে পারবো না। সে সব কিছু নয়—তিনি তেমন লোক নন।"

"তার মানে তিনি তেমন লোক হ'লে যা ভাবছি তাই হ'তে আপনার পক্ষে কোনও বাধা ছিল না। কেমন?"

"যান, আপনি ভারি দুষ্টু। কি যে বলেন সব আমাকে তার ঠিক নেই।"

"ব'লতাম না সিষ্টার, যদি আমার মিথ্যা মিলনীটা হ'ত। সংসারের অত্যাচারে সত্যি কথাটা বড্ড বেশী ব'লে ফেলি, ওই আমার দোষ।"

"আচ্ছা থামুন। শুনুন, আপনার কাছে আমার একটা বিশেষ কথা আছে।"

"নিশ্চয়ই আছে, সে আমি অনেকক্ষণ বুঝেছি।"

"কেমন করে বুঝলেন?"

"সে বুঝতে হয় যে! আপনারা আমার মিথ্যা মিলনীর সভ্য না হ'লেও মেয়েমানুষ, মনের কথাটা চট্ ক'রে মুখে বলা আপনাদের অভ্যাস

নেই। তাই আপনাদের সঙ্গে কারবারে আমাদের সর্ব্বদাই আসল কথাটা আন্দাজ ক'রেই নিতে হয়। হরি ভায়া এসেছে সেই খবরটুকু দেবার জন্যই যে আপনি এই দুপুরে আমার সন্ধানে আসেন নি, তা' আমি আঁচ ক'রেছি।"

"কি কথা ব'লতে এসেছি বলুন তো তবে?"

"না—সে বলছি না। বলতে গেলে হয় তো আসল কথাটাই ব'লে ফেলবো, আর আপনি চট্‌ ক'রে ব'লবেন তা নয়—আর সেই জন্য হয় তো কথাটা বলাই হবে না। আর যদি ভুল ক'রে অন্য একটা কিছু বলি, তবে হয়তো আপনি চটেই যাবেন।"

হাসিয়া লতিকা বলিল, আচ্ছা নাই বল্লেন, শুনুন। কথাটা এই—ইয়ে—এই বলছিলাম কি—আমার বিনয় আপনি যা' জানেন সেটা হ.রু—হরিবাবুকে দয়া করে বলবেন না।"

অসীম গম্ভীর হইয়া বলিল, "হুঁম।"

ব্যস্ত হইয়া লতিকা বলিল, "ব'লবেন না বলুন?"

অসীম বলিল, "আমি হয় তো কোনও দিনই কাউকে ব'লতাম না। কিন্তু আপনার গরজ দেখে ব'লতে ইচ্ছা ক'রছে—হয়তো ব'ল্লে কিছু মজা হ'তে পারে।"

"না দেখুন, এখন অমন ক্ষেপামো ক'রবেন না। বলবেন না দয়া ক'রে। কেনই বা বলবেন? কি লাভ বলুন? সে সব তো হ'য়ে ব''' গেছে, - এখন তো আর কিছু নেই। মিছেমিছি ওঁকে ব'লে ওঁর মন ভার ক'রে কি লাভ?"

"রসুন, আগে আমার একটা কথার জবাব দিন; বঁড়শী কি দু'দিকেই বিঁধেছে?"

"ওমা, কিসের বঁড়শী?"

"বলছি—আপনিই একা ম'রেছেন না সেও মরেছে?"

"কি ব'লছেন আপনি?"

"যাক, বুঝতে পারবার ইচ্ছে নেই আপনার—আমারই দেখে শুনে নিতে হবে। তা বেশ, এখন তবে আমি আসি।"

"ও কি? যাচ্ছেন বড়? ব'লে যান আমাকে—"

"যাচ্ছি. বিশেষ একটু তাড়া আছে—এখন পর্য্যন্ত পেটে কিছু পড়েনি কি না?"

"ওমা, তাই না কি? এতক্ষণ না খেয়ে আছেন,—দুটো যে বাজে!"

"কাজেই বুঝতে পারছেন—"

"তা যান—কিন্তু ব'লবেন না বলুন? আপনার পায়ে পড়ি,—মিছে আমাকে দুঃখ দিয়ে কি লাভ হবে আপনার?"

"দুঃখ দেওয়াটাই যে মানুষের কাজ। সে কথা আপনি জানেন না?"

লতিকা হতাশ হইয়া বলিল, "কিছুতেই কি আপনার দয়া হবে না?"

অসীম হাসিয়া বলিল, "মিছে ব্যস্ত হচ্ছেন সিষ্টার। আমি একটু মদ খাই ব'লেই আমাকে ছোট লোক ভাববেন না। তা' ছাড়া কিই বা আমি জানি যে বলবো। আমি হলপ ক'রে বলতে পারি, আপনি ঠিক যে ক'টা কথা ব'লেছেন এর বেশী এক বিন্দুও জানি না, আর জানলেও ব'লতাম না। যান—আপনাকে আর আটকে রাখবো না।" বলিয়া অসীম হঠাৎ হন হন করিয়া তার মেসে ঢুকিল। তার মুখের চিরস্থায়ী হাসিটি হঠাৎ যেন কোথায় মিলাইয়া গেল।

হরিচরণ লতিকার বাড়ীতে থাকে আর ঘর খুঁজিয়া বেড়ায়। একবার সে একজিবিশনের ছবিখানার খোঁজ করিয়াছিল।

সে শুনিল ছবিখানা ৫০৲ টাকায় বিক্রী হইয়া গিয়াছে। একশো টাকা তার দাম ধরা হইয়াছিল; কিন্তু বিক্রী হয় না, আর হরিচরণও লইতে আসে না দেখিয়া, রাজা বাহাদুর ৫০৲ টাকায় কিনিয়া রাখিয়াছেন। প্রাইজ কিছু পায় নাই, উল্লেখযোগ্য বলিয়া সার্টিফিকেটও পায় নাই।

মাত্র পঞ্চাশ টাকা। এই একজিবিশনে কত ছবি হাজার দু হাজার টাকায় বিক্রী হইয়াছে—নিতান্ত ছোট সাধারণ ছবিও পঞ্চাশ টাকায় বিক্রী হইয়াছে। আর তার ঐ বড় তৈলচিত্রের পঞ্চাশ টাকার বেশী দাম হইল না। হরিচরণ ভয়ানক দমিয়া গেল।

যাক, পঞ্চাশ টাকা তার কাছে তুচ্ছ করিবার বস্তু নয়। টাকা কয়টা হাতে করিয়া সে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া ঘরে ফিরিল।

পরের দিন সন্ধান করিয়া সন্ধ্যা বেলায় হরিচরণ লতিকাকে বলিল, "ঘর ঠিক হ'য়েছে, ভাড়া চার টাকা—এবার খোলার।"

লতিকা বলিল, "ঘর তো ঠিক ক'রলেন, কিন্তু খাবেন কি? আপনার রান্না যা জানা আছে সে তো আমি জানি। তা ছাড়া আপনার স্ত্রী

তো সাধে বলেন নি যে আপনি একেবারে তালভোলা—আপনি আপনার কাজ কর্ম্ম কেমন ক'রে ক'রবেন ?"

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া হরিচরণ বলিল, "কি ক'রবো বলুন ?—ভাঙ্গা কপাল নিয়ে জন্মালে এমন কত দুঃখ করতে হয় ! নইলে ছোট বউ যাবে কেন ?"

লতিকা বলিল, "আচ্ছা যাবার অত তাড়া কি ? থাকুনই না দুটো দিন আরও।"

"না সে হয় না। আপনার এখানে থাকা আর ভাল দেখায় না।"

লতিকা একটু অপ্রস্তুত হইল। সে বলিল, "দেখুন, তাতে যা লজ্জা সে আমার—আমি তা' সইতে প্রস্তুত আছি।"

হরিচরণ এ অর্থে কথাটা বলে নাই, সে বিব্রতভাবে তাড়াতাড়ি বলিল, "না—সে ভাবে আমি বলি নি। আমি বলছিলাম কি—সমর্থ বেটাছেলের পক্ষে পরের গলগ্রহ হ'য়ে থাকাটা গৌরবের কথা নয়।"

"দরকার কি গলগ্রহ হবার ? আপনি কাজ করুন, আমাকে টাকা দেবেন, ঘর ভাড়া আর খাওয়ার দরুণ। ধরুন, আমি আপনার landlady। আমার এ ঘরখানা অমনি পড়ে থাকে, একজন এমনি ভাড়াটে পেলে আমারও একটু সাশ্রয় হয়, আপনি নিজেকে দেখাশোনার দায় থেকে নিস্তার পান।"

এটা বিলাতী বন্দোবস্ত। লতিকা খৃষ্টান, অনাথাশ্রমে মানুষ হইয়াছে, তার পর দু এক জায়গায় paying guest হইয়া থাকিয়াছে—তার কাছে এ ব্যবস্থাটা যত সহজ মনে হইল, হরিচরণের কাছে তাহা তত সহজ নয়। এ ব্যবস্থাটা তার কাছে বড় দৃষ্টিকটু মনে হইল। সে কাজেই আপত্তি করিল।

লতিকা বলিল, "কেন ? এতে আপত্তি কি ?"

হরিচরণ শুধু বলিল, "সে আমি আপনাকে বোঝাতে পারবো না।"

লতিকা বলিল, "তবে বুঝেছি—আচ্ছা যান।" বলিয়া মুখ ভার করিয়া উঠিয়া গেল।

হরিচরণ বড বিপদে পডিল। লতিকার মনে ব্যথা দিতে সে চায় না ;

কিন্তু এমনি করিয়া থাকাও তো তার পক্ষে অসম্ভব! সে কি করিবে কিছুই ভাবিয়া পাইল না।

তখনকার মত কথাটা মুলতবী রহিল।

পরের দিন বৈকালে অসীম আসিল। হরিচরণ তখন বাহিরে গিয়াছে, লতিকা একা ছিল।

লতিকার চোখে জল।

অসীম ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া পাশে বসিয়া বলিল, "ও কি, আপনি কাঁদছেন?"

চক্ষু মুছিয়া লতিকা বলিল, "না কাঁদবো কেন? কাঁদাটা যে মেয়েমানুষের স্বভাব ধর্ম্ম!"

"তা জানি; কিন্তু আপনার পক্ষে এটা খুব স্বাভাবিক ঠেকছে না। কেন না, মেয়েমানুষের যে সব বালাই থাকে, যার জন্য তার কাঁদতে হয়—স্বামী, পুত্র, কন্যা—ইত্যাদি, তা' আপনার নেই। স্বাধীন মানুষ আপনি—রোজগার ক'রছেন, খাচ্ছেন দাচ্ছেন—"

"আর রুগী ঘাঁটছেন! বড় সুখের জীবন, না? যদি এমনি ক'রতে হ'ত আপনার তবে বুঝতেন। কি শূন্য, কি ফাঁকা এ জীবন—একটা এমন কেউ নেই যার জন্য দুটো রাঁধবো, যাকে খাওয়াবো বা যত্ন ক'রবো। শুধু রুগী, রুগী, রুগী—দিনের পর দিন তাদের কাতরানি, তাদের ধ্যাঙানি, তাদের রোগ। যে গেরস্থের বাড়ীতে মাসে দশ দিন কারো অসুখ যায় সে হাঁপিয়ে ওঠে—আর আমাদের জীবনটাই শুধু রুগী ঘাঁটা।"

একটু তফাৎ আছে সিষ্টার,—গেরস্থর ব্যারাম ঘরে—আপনার বাইরে। এত শুধু আপনাকে খাটুনির কষ্টই পেতে হয়—প্রাণের কষ্ট তো নেই।"

"তাইতেই তো সবচেয়ে হাঁপিয়ে ওঠে প্রাণ। আপনার জনের যদি অসুখ হয়, তবে প্রাণ দিয়ে তার সেবা করা যায়—তাতে ক্লান্তি হয় না। কিন্তু কোথাকার কে পথে কুড়ানো রুগী, যার সঙ্গে আমার জানা-শোনাই নেই, তার রোগ ঘাঁটা যে কেবলি গা খাটান—কুলী মজুরের মত কাজ—কেবল খাটুনী, রস কিছু নেই। আপনার লোকের সেবা ক'রতে প্রাণের কষ্ট যে পেতে হয়, সে যে আমার মাথার মাণিক। হোক কষ্ট—তবু সেটা আঁকড়ে ধরে থাকতে ইচ্ছা করে।"

"এ দুঃখের জন্য এত লোভ আপনার? তা সেও তো জুটেছে। হরির বউকে যে সেবা ক'রেছেন, তার ভেতর তো আপনার চোখ বড় একটা শুকনো থাকে নি।"

"ঐ একটি। ঐ একটি মেয়েকেই আমার আপনার জন ব'লে মনে হ'য়েছিল। কি সুন্দর মেয়েটি—আর কি ভালবাসা তার! আহা, তার কথা শুনে আমার মনে হ'ত, এমনি ক'রে ভালবাসতে পারলে ম'রেও সুখ। তার সেবা যে ক'টা দিন ক'রেছি, সে ক'দিন কষ্টকে কষ্ট ব'লে মনে হয় নি।"

"তা যাক গে, বালাইয়ের উপর যদি আপনার এত টান, তবে আর দুঃখ কষ্ট। বালাই তো ঘরে ব'য়ে এনেছেন। ভালো তো বেসে ফেলেছেন।"

"কে বল্লে? কোথায় ভালবাসা? আর ভালবাসলেই কি? আমি না দেখতে ভাল, না আমার কোনও গুণ আছে, না টাকা আছে যে লোকে আমায় ভালবাসবে?"

হাসিয়া অসীম বলিল, "কিন্তু এমন বেকুব শুধু একটা নয় অনেক আছে, যারা এ সত্ত্বেও ভালবাসে আপনাকে হয় তো! যেমন আমার বন্ধু হরি।"

"ভালবাসে না ছাই। ওঁর স্ত্রীকে একটু সেবা ক'রেছিলাম, তাই একটুখানি ভাল চক্ষে দেখেন। তা ছাড়া দেখেন গরীব আমি, আপনার জন কেউ নেই, একটু হয় তো দয়া করেন, এই। ভাল আমাকে বাসবেন কি দেখে? চুলোয় যা'ক, ভালবাসা আমি চাই না, নিজের সুখ-সুবিধাটুকু যদি উনি বোঝেন তবেই বর্ত্তে যাই। বেতাল মানুষ, নিজের সম্বন্ধে জ্ঞান-গোচর কিছুই নেই—জলটি গড়িয়ে খেতে পারেন না ভাল ক'রে। স্ত্রী ছিল তাই চ'লে গেছে। এখন আছেন এখানে—আমি দেখি শুনি তবু বেঁচে আছেন। তাতেও মন উঠছে না, এসে অবধি উড়ু উড়ু ক'রছেন। আজ কোথায় আবার ঘর ঠিক ক'রে এসেছেন।" বলিয়া লতিকা ভয়ানক মুখ ভার করিল।

"ও, এই কথা! তা' এতক্ষণ কথাটা খোলসা ক'রে ব'ল্লেই হ'ত। ও আমি ঠিক ক'রে দিচ্ছি।"

"দেখুন, দিন তো ঠিক ক'রে। কি বেয়াড়া খেয়াল দেখুন। আমার এখানে থাকলে না কি ওঁর পৌরুষ খর্ব্ব হবে। আমি বল্লাম, বেশ তো

থাকুন না paying guest হ'য়ে। তাতেও না কি তাঁর লজ্জা! কি করি বলুন তো?"

হাসিয়া অসীম স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলিল, "কোনও ভয় নেই, আমি আপনার loverকে ঠিক ক'রে দিচ্ছি।"

"ও কি কথা হ'ল—যান, আপনি বড় যা' তা' বলেন—lover কেন হ'তে যাবে!"

"আপনি মিথ্যা-মিলনীর পাকা মেম্বার হ'য়েছেন দেখছি। এত কথা খুলে' ব'লে যেই সত্যের সঙ্গে সামনা-সামনি হ'লেন অমনি বেঁকে ব'সলেন। আরে ঠাকরুণ, এই ছলনাটুকু আর আমি বুঝি না?"

"না দেখুন, খবরদার এমন কথা তাকে ব'লবেন না। আপনি যা' বলছেন তার যদি একটু আভাস সে পায়, তবে অমনি ছিটকে পালাবে। তাকে আপনি চেনেন না ভাল ক'রে। এখনও রোজ শুয়ে থাকে ওই মূর্ত্তিটার পায়ে মাথা রেখে।"

"তবে স্বীকার করুন আপনি তাকে ভালবাসেন!

সলজ্জ হাসি হাসিয়া লতিকা বলিল, "যান—আপনি বড় দুষ্টু। খালি আমাকে লজ্জা দেবেন!"

"লজ্জা যে নারীর ভূষণ! আপনার মুখের উপর লজ্জাটা এখন এমন সজ্জা ক'রেছে যে তার কাছে হীরা-মণির গয়না হার মানে।" বলিয়া অসীম হঠাৎ উঠিয়া চলিয়া গেল।

১৪

"অসীমের ঘরে বসিয়া হরিচরণ বলিল, "অসীমদা,' আমার পেট চলার একটা উপায় ক'রে দাও! তুমি এত বড় নামজাদা লেখক—এখন তুমি একটা কথা ব'ল্লে পাব্‌লিশার ফেলতে পারবে না।"

অসীম বলিল, "হরি ভাই, তুমি আমায় কথাটা ব'লে লজ্জা দিলে? তুমি কি ভাবছো, তুমি ব'লবে তবে আমি চেষ্টা ক'রবো? আমি কি নিজে দেখতে পাইনে, তোমার কাজের দরকার? আমি ব'লেছি, কিন্তু বাবুরা গা' করেন না। কেন না, নাম আমার যতই থাক, তাতে আমার ট্যাঁক ভরে না। পাবলিশারের কাছে হাত আমার পাতাই আছে—আমার নিজের পেট ভরাবার জন্যে। কাজেই, দেনাদারের অনুরোধ তাঁরা গায়ে মাখেন না।"

"কেন দাদা? তোবার এত অভাব কিসের? তুমি তো খুব কম হ'লেও মাসে দু' তিনশো টাকা পাও, আর থাক তো এই মেসে, একা। তোমার অভাব এত কিসের?"

"বল তো ভাই? অভাব কিসের?—কত পাই আমি তা কখনও খতিয়ে দেখি নি, তবে ঘরে যা আনি তা নেহাৎ কম হবে না। কিন্তু সব এই দোর পর্য্যন্ত। পাওনাদারের তাগাদায় অস্থির হ'লে ছুটে' যাই পাবলিশারের কাছে, এনে, তাদের দিয়ে থুয়ে পরিষ্কার। ব্যস্, তার পর যে অসীম সেই অসীম।"

কিন্তু এত পাওনাদার তোমার জোটে কোত্থেকে?"

"তাই তো আমি ভাবি। আমার একটা থিওরী আছে। মানুষ জন্মে একটা অদৃষ্টের কাচের ডোমের ভিতর। যাদের ডোমটা আস্ত থাকে তারা বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে কাটিয়া যায়। আর যাদের সেটায় ফাট ধরে বা ভেঙ্গে যায়, তাদের সেই ফাঁক দিয়ে বাইরে থেকে নানা রকম অমঙ্গল এসে জোটে। আমার অদৃষ্টের মোড়কটার মধ্যে একটা মস্ত বড় ফুটো আছে—

এ শয়তানের বাচ্ছাগুলো সেই ফুটোর ভেতর দিয়ে পিল পিল ক'রে ঢুকছে অসংখ্য--যেন রক্তবীজের ছানা—তাদের ঠেকাবার কোনও উপায় নেই।"

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া হরিচরণ বলিল, "তাই যদি হয়, তবে আমার অদৃষ্টের ডোমটা বুঝি একেবারে শক্ত ঘা' খেয়ে চুরমার হ'য়ে গেছে। অমঙ্গলকে আর আমার কাছে আসতে পথ খুঁজতে হয় না, সারবন্দী হ'য়ে আসতে হয় না। হুড়মুড় ক'রে চার ধার দিয়ে তারা হৈ হৈ ক'রে ছুটে আসে।"

হাসিয়া অসীম বলিল, "নিজেকে তুমি যতটা বেশী দুর্ভাগা ভাবছো, হয় তো তা' তুমি নও। অন্ততঃ এক দিকে তো তোমার সৌভাগ্য হ'য়েছে—মেয়েমানুষের প্রাণভরা ভালবাসা তুমি পেয়েছ—সে বড় একটা কম সম্পদ নয়!"

হরিচরণের সমস্ত মুখের উপর একটা তীব্র বেদনার ছায়া পড়িয়া গেল—তার পত্নীর স্মৃতি এখনও তার অন্তরে টাটকা ঘায়ের মত টন্ টন্ করিতেছিল। সে একটু পরে গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "হ্যাঁ, ছিল। কিন্তু সে সৌভাগ্য তো জালিয়ে পুড়িয়ে খাক ক'রে দিয়েছি। ভাল যে বেসেছিল, তাকে শুধু দুঃখ দিয়েই বিদায় ক'রেছি।"

নিবিড় সহানুভূতির সহিত অসীম বলিল, "শুধু দুঃখ দাও নি ভাই, তাকে তুমি যা দিয়েছ, সে একটা জীবনভরা সুখের মূল্য দিয়েও তা কিনতে পারতো। তুমি তাকে যে ভালবাসা দিয়েছ, সে সৌভাগ্যটা তুমি ছোট ক'রে ভাবছ, কিন্তু সে ভাবে নি।"

"না—তা সে ভাবে নি—সে শুধু আমায় বড় ভালবাসতো ব'লে।" হরিচরণের চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল। তার পর খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সে বলিল, "যাক, কিন্তু সে সব তো চুকে গেছে—এখন তো আমি পরিপূর্ণরূপে হতভাগা।"

"আমার ঠিক তা মনে হচ্ছে না। আমার মনে হ'চ্ছে সাধ্বী স্ত্রীর ভালবাসা অমর। ম'লেও সে মরে না।"

হরিচরণ একটু বিস্মিত হইয়া বলিল, "তোমার মুখে এ কথা অসীমদা'? তুমি তো মান না কিছু—পরলোক, অমরতা, সব তো তোমার কাছে ভুয়ো কথা।"

"নিশ্চয় ! যে মরে সে বেঁচে থাকে না, কিন্তু আশ্চর্য্য এই ভাই, তার ভালবাসাটা থাকে।"

"হাঁ—সে থাকে তার প্রণয়ীর মনের ভিতরটা বিষের কাঁটাগাছ হয়ে।"

"না, নারীর চিত্তে মনোরম পারিজাত হ'য়ে।—অবাক্ হ'চ্ছ ? কিন্তু কথাটা ঠিক। দেশে, আমার বাড়ীতে একবার একটা সূর্য্যমুখীর চারা পুঁতেছিলাম। তাতে ফুটেছিল একটি ফুল—কিন্তু একাই সে বাগান আলো ক'রে রেখেছিল—এত বড় ছিল সে ফুল ! ক্রমে শুকিয়ে গেল সে ফুল। গাছটাও শুকিয়ে গেল। জঞ্জাল ব'লে তাকে উপড়ে ফেলে দিলাম—ভাবলাম, সব চুকে বুকে গেল। মাটি খুঁড়ে আবার চারার জন্য জমী তৈয়ের ক'রলাম, সার দিলাম। কিছুদিন যেতে না যেতে দেখি সেই মাটি ফুঁড়ে বেরিয়েছে একটা চারা—দেখতে দেখতে সে বেড়ে উঠলো, ক্রমে ফুল ফুটলো, দেখি সেই সূর্য্যমুখী। সে গেছে—কিন্তু তার শোভাটুকু রেখে গেছে জমা ক'রে মাটির বুকে।"

হরিচরণ শুষ্ক হাসি হাসিয়া বলিল, "আমার তো তাও নেই। সে যদি রেখে যেতো এক ফোঁটা একটা মেয়ে—নাঃ—তা হ'লে সেও তো না খেয়ে ম'রতো।"

তবু তার ভালবাসা বেঁচে আছে—সেটুকু সে কেমন ক'রে জানি না, জমা ক'রে রেখে গেছে আর একটী নারীর বুকে।"

"তার মানে ?"

একটু রোখের সহিত অসীম বলিল, "তার মানে তুমি অন্ধ—বিদ্যাসাগরের মতে তুমি একটি পুত্তলিকা—যার চক্ষু আছে কিন্তু দেখিতে পায় না।" বলিয়া সে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল।

হরিচরণ একটু ভাবিয়া বলিল, "আমি বুঝতে পারছি তুমি কাকে লক্ষ্য ক'রে কথাটা ব'লছ। কিন্তু—অসীমদা, তোমার কাছে আমি এটা আশা করি নি। একজন পুরুষ ও একটি নারীর মধ্যে দুটো কথাবার্ত্তা হ'লেই বাজে লোকে নানা সন্দেহ ক'রে থাকে। কিন্তু তোমাকে আমি ততটা খাটো ক'রে দেখি নি। লতিকাকে আমি শ্রদ্ধা করি—তার প্রতি আমার দেনার অন্ত নেই। সে আমাকে করুণার চক্ষে দেখে, সে আমার

বৌকে ভালবেসেছিল ব'লে। এই সোজা কথাটুকু থেকে তুমি যে মনে ভেবে ব'সবে যে আমাদের মধ্যে একটা কিছু হ'য়েছে"—

"তুমি গণ্ডমূর্খ! আমি বুঝি সেই কথা ব'লেছি। আমি যা ব'লেছি তার বেশী কিছু মনে লুকানো নেই। আর সে কথাটা সত্যি। লতিকা তোমাকে ভালবাসে—এমন ভালবাসে যে তোমার বউ তোমাকে তার চেয়ে বেশী ভালবাসতো না। তুমি যে সে কথা জান না, তা আমি জানি।"

হরিচরণের মনে কথাটায় যেন চমক লাগিয়া গেল। সত্যি কি? সে মাথা নীচু করিয়া ভাবিতে লাগিল। অনেকক্ষণ সে ভাবিল।—একবার মনে হইল, কথাটা সত্য। তার পর আবার ভাবিয়া চিন্তিয়া সে স্থির করিলল বাজে কথা। অসীম সেই শ্রেণীর লোক—যারা মনে করে স্ত্রীলোকের পুরুষের প্রতি কোমলতার শুধু এক পর্য্যায় আছে। তাই লতিকার দরদের ভিতর সে প্রেম ছাড়া কিছু দেখিতে পায় না। কিন্তু হরিচরণের মনে হইল, সে লতিকার মনের খবরটা ঠিক জানে—সে হরিচরণকে স্নেহ করে, করুণা করে—বিশে'র কথা স্মরণ করিয়া; কিন্তু হরিচরণের প্রতি তার প্রেম—অসম্ভব।

সে একটু হাসিয়া বলিল, "অসীমদা, মাপ ক'রো, মেয়েমানুষের ভালোবাসা সম্বন্ধে তোমার মতামতের খুব বেশী মূল্য দিতে পারছি নে আমি। তুমি আমার চেয়ে মেয়েমানুষ ঘেঁটেছ ঢের বেশী, কিন্তু তাদের সত্যিকারের ভালবাসা কখনও পাও নি। তাই রজ্জুতে তুমি সর্প ভ্রম কর।"

অসীম একটু শ্লেষের সহিত হরিচরণের দাড়ি নাড়া দিয়া বলিল, "Baby! আমাকে প্রেম শেখাবে তুমি? আমি চিনি নে ভালোবাসা?—যাক চুলোয় যাক।"

হরিচরণ বলিল, "হাঁ—যাক চুলোয়। কেন না, সে ভালবাসুক আর না বাসুক তাতে কিছু আসে যায় না। কেন না, আমার এখন ঠিক ভালবাসা নেবার বা দেবার অবস্থা নয়। পোড়া মাটিতে ফুলের চারা গজায় না! যে ঘর উড়ে পুড়ে গেছে তার শূন্য ভিটেয় প্রদীপ জ্বালবার ইচ্ছাটাও হাসির কথা। ঘর না বেঁধে তাতে প্রদীপের রোশনাই করবার মত বেকুফী আর আমার দ্বারা হবে না।"

গম্ভীরভাবে অসীম বলিল, "তুমি কি ভেবেছ আর বিয়ে ক'রবে না ?"

"কখনও করবো না তা ব'লতে পারি না। কিন্তু সম্প্রতি বিয়ে ক'রবার কল্পনাও মনে আনতে পারি না। বিয়ে করবার আগে খাবার জোগাড় অন্ততঃ থাকা যে উচিত এ সত্যটা ঠেকে শিখেছি।"

অসীম গাহিল, "বানের মুখে কাঠ—"

হরিচরণ বলিল, "বানে ভাসছি হয় তো ঠিক ভাই, কিন্তু কাঠ আমরা নই। মানুষ যখন, তখন ভেবে চিন্তে খানিকটা ঠিক ক'রতে হয় বই কি ?"

"যাক গে। তুমি না কি ওখান থেকে উঠবার মতলব ক'রছো ?"

"হাঁ—একটা ঘর ঠিক ক'রেছি। কাল যাব মনে ক'রেছি।"

"তারপর ? খাবার জোগাড় ?"

"সেই সন্ধানেই ঘুরছি – তাই এলাম তোমার কাছে।"

"সে কথা বলছি না মুখ্খু ! চাল ডালের জোগাড় হ'লেই খিচুড়ী হয় না, তাকে রাঁধতে জানা দরকার। রোজগার না হয় তুমি ক'রলে কিন্তু তোমাকে চালিয়ে নেবে কে ? তুমি যে হাবা গঙ্গারাম, জান কেবল ছবি আঁকতে, একা একা নিজেকে দু'দিন চালিয়ে নেবার ক্ষেমতা তোমার নেই।"

হাসিয়া হরিচরণ বলিল, "আচ্ছা এসে দেখে নিও। এতদিন দরকার হয় নি তাই নিজে কিছুই করি নি—এখন ক'রতেই হবে।"

অসীম অনেকক্ষণ ধরিয়া ভাবিল। তার পর সে বলিল, "একটা কাজ আমার হাতে আছে—পারবে তা' ক'রতে ?"

"কি কাজ ?"

"একটা ছবি আঁকতে হবে, আমার আইডিয়া নিয়ে। ছবিটা আমার একটা বইয়ে ছাপা হবে, কিন্তু তুমি আঁকবে বেশ বড় ক'রে রং দিয়ে।"

"এ আর না পারবো কেন ? কি ছবি হবে বল।"

"ছবিটার নাম হবে, 'করুণা'—কিন্তু ছাঁকা idealistic ছবি চাইনে আমি,—একটি সাধারণ মেয়ের মুখে ফুটিয়ে তুলতে হবে করুণার ভাব। আমি তোমায় মডেল দেব, সেই মডেল নিয়ে তোমায় আঁকতে হবে।"

"তা বেশ।"

"কিন্তু একটু সামান্য অসুবিধা আছে। তোমাকে আঁকতে হবে সেই

মডেলের বাড়ীতে গিয়ে। ঠিক ছবি তোলবার মত sitting নেবে না। সর্ব্বক্ষণ তুমি তাকে দেখবে—মাঝে মাঝে দেখতে পাবে তা'র মুখে জীবন্ত করুণার ছবি ফুটে উঠছে—আমি তা' দেখেছি। ঠিক সেই সময় তোমার তুলি নিয়ে ব'সে সেই ভাবটা তুলে নিতে হবে। কাজেই তোমায় থাকতে হবে তার বাড়ীতে।”

হরিচরণ এতটু ভাবিয়া বলিল, “বুঝেছি—মোনালিসার মতন, তাই ক'রবো,—নইলে আর চলছে কই? কে তোমার মডেল?”

“লতিকা!”

হরিচরণ বলিল, “ওঃ, তামাসা হচ্ছিল আমার সঙ্গে!” তার সুরে আশায় নিরাশায় ব্যথিত সুর বাজিয়া উঠিল।

অসীম বলিল, “না ভাই, তামাসা নয়, খাঁটি কথা। আমি লতিকার মুখে ওই ভাবটা দেখে অবধি ভেবেছি যে ওটাকে আমার কাজে লাগাব। একখানা বই লিখছি, কিন্তু কেবলি মনে হ'চ্ছে, কলমের আঁচড়ে ও জিনিসটাকে জ্যান্ত ক'রে তোলা যাবে না। তাই তোমার শরণ নিচ্ছি। তুমি ছবিখানা এঁকে দেও, পারিশ্রমিকের উপযুক্ত বন্দোবস্ত আমি ক'রবো।”

হরিচরণের প্রথমে বিশ্বাস হইল না। তার পর সে যখন দেখিল অসীমের প্রস্তাব পরিহাস নয়, তখন সে সম্মত হইল।

কাজেই আপাততঃ, ছবি শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত তার লতিকার গৃহ ত্যাগ করিবার প্রস্তাব মুলতুবী রহিল। অসীম তাকে বলিল, এ সম্বন্ধে তার নামটা লতিকার কাছে না করাই ভাল।

১৫

দুই দিন পরে অসীম লতিকার সঙ্গে দেখা করিল। হরিচরণ বাড়ী ছিল না।

অসীম বলিল, "কি গো ঠাকরুণ, হরি কোথায়?"

লতিকা হাসিমুখে তাকে সম্বর্দ্ধনা করিতে অগ্রসর হইল। এ কথায় যেন তার হাসি একটা মধুর আবেগে ভরিয়া গেল। অসীম সে মুখ দেখিয়া খুসী হইল।

লতিকা বলিল, "এই বেরিয়েছেন একটু।"

অসীম বলিল. "সে এখান থেকে চ'লে যায় নি তা' হ'লে?"

সলজ্জভাবে লতিকা বলিল, "না। ভাড়া করা ঘরটা ছেড়ে দিয়ে এয়েছে, বেঁচেছি।"

"তারপর?" অসীম হাসিল।

"তারপর আবার কি? এখানেই আছে।"

"শুধু আছে? আর কিছু নয়?" অসীম আবার হাসিল।

লতিকা সলজ্জ হাসি হাসিয়া বলিল, "আবার কি হবে?"

"কেন? ছবি আঁকা হ'চ্ছে যে?"

"আপনি কেমন ক'রে জানলেন?"

"কেন? হরিচরণের সঙ্গে কি আমার আলাপ নেই ভাবছেন না কি?"

"ও, তাই!"—লজ্জায় আনন্দে লতিকার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল—"আশ্চর্য্য খেয়াল দেখুন। আমাকে মডেল ক'রে ছবি আঁকছেন। সে ছবির যা ছিরি হচ্ছে তা' বুঝতেই পারছি। আমার না কি আবার ছবি হয়?"

"কি জানেন? যে যাকে ভালবাসে সে তার ভিতর অনেক রূপ দেখতে পায় যা অন্য কারও চোখেই পড়ে না।"

"কক্ষনো না—ভালবাসে না আরও কিছু ?"

"নইলে সহরে এত সুন্দর মেয়ে থাকতে আপনার ছবি তুলতে যায় কেন ?"

"সে ওঁর খেয়াল ! কিম্বা হয়তো কোনও ভিখিরি কি ম্যাথরাণীর ছবি আঁকবেন, তাই আমার মুখ পছন্দ হয়েছে !"

হাসিয়া অসীম বলিল, "এখন দেখতে পাচ্ছেন তো আমার মিথ্যা-মিলনী কেমন চমৎকার চ'লতে পারে—কেন না, আপনার কথা শুনে আমার একটুও বুঝতে কষ্ট হ'চ্ছে না যে আপনার মনে সত্যি সত্যি কি হ'চ্ছে ।"

"কি হ'চ্ছে ?"

"আপনি দুটো কথা ভাবছেন,—এক ভাবছেন, নিশ্চয় হরিচরণ আপনাকে ভালবাসে ; নইলে সে আপনার ছবি তুলতে যাবে কেন ? আর ভাবছেন, আপনি নিশ্চয় খুব সুন্দর ; নইলে আর্টিষ্ট হয়ে হরিচরণ আপনার ছবি আঁকে ?"

"যান, কক্ষনো না। আমি কিছু ওসব ভাবছি না। আমার যে রূপ সে আমার দেখা আছে। তা নয় ; তবে হাঁ, এই খেয়াল নিয়ে যে উনি তবু এখানে দুদিন আছেন— সেইটেই আমার লাভ।"

অসীম আত্মবিস্মৃত হইয়া মুগ্ধ দৃষ্টিতে লতিকার দিকে চাহিয়া ছিল। লতিকা তাহা দেখিয়া লজ্জিত হইয়া মুখ নীচু করিল। অসীম ছোট্ট একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস মনের ভিতর চাপিয়া বলিল, "তবু তো আপনি ভালবাসেন না ! ভালবাসেন না হরিকে, তবু সে দুদিন র'য়ে গেল, সেই আনন্দে একেবারে মুখ চোখ ছেয়ে গেছে। ভালবাসলে বোধ হয় হাওয়ায় উড়তে থাকতেন।"

"যান—আপনি কিছু বোঝেন না।"

"অর্থাৎ, আমি অতি বিশ্রী লোক, আপনার মনের কথা চটপট ধ'রে ফেলি।"

"কক্ষণও না।"

"অর্থাৎ—তাই তো বিপদ !"

"না—আপনার সঙ্গে কে পারবে বলুন। কথার ব্যবসা ক'রে খান আপনি।"

"তবেই তো বুঝতে পারছেন আপনি,—আমার সঙ্গে সাদাসিধে মনের কথা খুলে বলাই সব চেয়ে নিরাপদ।"

"খুলে বলাতে কিই বা বাকী রেখেছেন আপনি!" বলিয়া লতিকা লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিল।

"আপনার দিকের কথাটা বেশ বুঝেছি, কিন্তু ও'পক্ষের ভাব কেমন বুঝছেন? হরি কি এগুচ্ছে না পিছুচ্ছে? বঁড়শী গিলেছে, না ঠোকরাচ্ছে, না শুধু ঘাই মারছে?"

"কি জানি,—আমি কোথেকে জানবো সে কথা?"

"তবু আপনার কি মনে হ'চ্ছে?"

একটু থামিয়া লতিকা বলিল, "না—আমি তা' বলবো না—কে জানে আপনি শুনলে হয় তো ঠাট্টা ক'রবেন।"

"রাম বল! এ কি ঠাট্টার কথা যে ঠাট্টা ক'রবো? আপনি নির্ভয়ে বলুন।"

"আমার মনে হ'চ্ছে যেন—এই এমন কিছু নয়—তবু যেন মনটা একটু নরম হ'য়েছে।"

"বটে? কিসে বুঝলেন শুনি?"

একটা প্রচণ্ড আবেগ যেন লতিকাকে ভরিয়া ফেলিল। এ কথার আলোচনায় তার মনে যে সব স্মৃতি জাগিয়া উঠিল, তাতে তার সমস্ত শরীর যেন একটা প্রগাঢ় পুলকে টলমল হইয়া উঠিয়াছে—তার চিত্তের বেগ যেন সে ধারণ করিতে পারিতেছে না।

সে বলিল, "এমন কিছু নয়, কিন্তু এখন আর সর্ব্বক্ষণ তাঁর ঘরে ব'সে থাকেন না, আমার কাছে সব সময়ে এসে বসেন, গল্পসল্প করেন—আর—মাঝে মাঝে দেখেছি—আড়াল থেকে উনি আমার মুখের দিকে চেয়ে আছেন—দেখে মনে হয় কি যেন খুঁজছেন, কি যেন ভাবছেন, আমার কথা।"

লতিকা ঘন ঘন নিঃশ্বাস লইতে লাগিল।

অসীম পুলকিত হইয়া বলিল, "বেশ বেশ, খুব খুসী হ'লাম। আশীর্ব্বাদ করি—তোমরা দুজনে সুখী হও।" তার কণ্ঠস্বরে একটুও পরিহাসের সুর ছিল না।

লতিকা বলিল, "দেখুন,—দয়া ক'রে এ-সব কথা তাঁর কাছে ব'লবেন না। তা' হ'লে—ব'লবেন না যেন।"

"না বলবো না—আমাকে এত অবিশ্বাস ক'রবার কোনও কারণ পেয়েছ কি? একেবারে 'আমি' ছেড়ে 'তুমি'।"

অসীম উঠিল।

১৬

লতিকা বসিয়া রান্নার জোগাড় করিতেছিল। তরকারীগুলি সুন্দর করিয়া কুটিয়া, ধুইয়া সে পরিপাটি করিয়া থালার উপর সাজাইয়া রাখিল। চাল ডাল বাছিয়া ধুইয়া দুটি বড় বাটিতে সাজাইল। ঘুরিয়া ফিরিয়া সে তেল-ঘি মশলা সব জোগাড় করিয়া একসঙ্গে পরিচ্ছন্ন করিয়া রাখিল।

হরিচরণ একটু তফাতে একখানা কাগজ ও রং লইয়া বসিয়া একাগ্র মনে তার দিকে চাহিয়া দেখিতেছিল, আর কাগজের উপর পেন্সিল ও তুলির আঁচড় দিতেছিল।

লতিকা তার কাজে তন্ময় হইয়া ছিল,—হরিচরণ যে কখন আসিয়া ছবি আঁকিতে লাগিয়া গিয়াছে, সেটা সে লক্ষ্য করে নাই। সে একমনে তার অভ্যস্ত পরিচ্ছন্নতার সহিত তার কাজ করিয়া যাইতেছিল। কিন্তু আজকালকার রান্নার জোগাড়ের মধ্যে তার পরিচ্ছন্নতার চেয়ে বেশী একটা কিছু ছিল। হরিচরণ তার ঘর হইতে আসিয়া যখন তাকে দেখিল, তখন সেই জিনিসটা তার চোখে পড়িয়া গেল। সে তাড়াতাড়ি কাগজ-পত্র লইয়া বসিয়া গেল।

তুচ্ছ রান্নার কাজ, তাও লতিকা করে যেন ছবির মত। তার কোটা তরকারী, মশলার থালা, তেলের বাটী সব যেন আর্টিষ্টের সাজান একটা ছবির উপকরণ। তা ছাড়া আজ একটা নিবিড় স্নেহ তার মুখের উপর ফুটিয়া উঠিয়া তার সমস্ত কাজ অপরূপ সৌরভে মণ্ডিত করিয়া দিয়াছিল। মুখে চোখে, হাত নাড়ায়, পায়ের গতিতে সর্ব্বত্র যেন এই স্নেহ, এ দরদ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছিল। এই কথাটা তার সমস্ত অন্তর ছাইয়া ছিল যে, সে রান্না করিতেছে হরিচরণের জন্য; তাকে সে ভাল করিয়া খাওয়াইবে! খাইয়া সে তৃপ্ত হইবে এই আশা, এই আনন্দ তার কাজের ভিতর অপূর্ব্ব লালিত্য সঞ্চার করিয়াছিল, তার কর্ম্মরত মুখমণ্ডলে অপূর্ব্ব শ্রী ঢালিয়া দিয়াছে।

লতিকা কাজ করিয়া গেল, হরিচরণের চঞ্চল অঙ্গুলি কাগজের উপর রেখার পর রেখা টানিয়া গেল—অনেকক্ষণ। তার পর, জোগাড় শেষ হইলে লতিকা আঁচল দিয়া মুখের ঘাম মুছিয়া মুখ তুলিয়া চাহিল।

হরিচরণকে দেখিয়া তার মুখ আনন্দে ভরিয়া গেল। স্নিগ্ধ উজ্জ্বল হাসিতে মুখ ভরিয়া সে বলিল, "ও কি হ'চ্ছে ওখানে ব'সে ?"

হরিচরণ হাসিয়া বলিল, "আপনার একটুখানি রূপ চুরী ক'রে নিলাম।"

এ কথায় লতিকার মনটা যেন আনন্দে নাচিয়া উঠিল। তার চোখ বলিল, "ওরে সর্ব্বনেশে চোর, তুই আমার সবটুকু চুরি করবি ব'লেই যে আমি আমার সব দুয়ার খুলে ব'সে আছি।"

হাসিয়া সে বলিল, "দেশে কি রূপের এত দুর্ভিক্ষ হ'য়েছে যে আমার কাছে রূপ চুরি ক'রতে আসতে হ'ল আপনার মত আর্টিষ্টের ? তা ছাড়া চুরি কাজটা ভাল নয়।"

"কিন্তু যে সম্পদ চুরী ক'রে ছাড়া পাওয়াই যায় না, তাকে চুরি করা ছাড়া উপায় কি ?"

অগ্রসর হইয়া লতিকা বলিল, "দেখি, কি এমন অপরূপ সম্পদ চুরি ক'রলেন আপনি ?"

হরিচরণ কাগজ চাপিয়া বলিল, "এখন দেখতে পাবেন না। এটা শেষ হ'লে তবে দেখাব।"

লতিকা বলিল, "সে হবে না, কি সাপ ব্যাং আঁকলেন আমাকে দেখাতেই হবে।"

সে হরিচরণের হাত চাপিয়া ধরিল—এই প্রথম! সর্ব্বাঙ্গে সে পুলকের শিহরণ অনুভব করিল, চক্ষু তার প্রীতিতে ঢল ঢল হইয়া উঠিল, মুখে ভাসিয়া উঠিল প্রণয়ের সুমধুর বিচিত্র রাগ।

হরিচরণ এক মুহূর্ত্ত সে দিকে চাহিয়া রহিল। সে ছবি দেখাইল না, বলিল, "আচ্ছা, দেখাব। কিন্তু তাহ'লে আর একটু দাঁড়ান গে ওখানে—আমি চটপট শেষ ক'রে নি, তার পর দেখবেন।"

লতিকা দাঁড়াইল। ঠিক কেমন করিয়া দাঁড়াইবে সে সম্বন্ধে হরিচরণ উপদেশ দিল—শেষে নিজে আসিয়া হাত মুখ নাড়িয়া তাকে ঠিক করিয়া

দাঁড় করাইয়া দিল। তার সে স্নিগ্ধ অঙ্গস্পর্শে লতিকা কৃতার্থ হইয়া গেল। অনেকক্ষণ সে দাঁড়াইয়া রহিল এমনি করিয়া হরিচরণের চোখের সামনে, তার দিকে চাহিয়া—দৃষ্টিতে তার অপূর্ব্ব তৃপ্তি ও প্রীতি ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

হরিচরণ তাঁকে দাঁড় করাইয়া একবার মুগ্ধ দৃষ্টিতে তার দিকে চাহিল। তার মনে হইল লতিকার ভিতর লুকান আছে রূপ। সেই রূপ দেখিয়া তার আর্টিষ্টের দৃষ্টি পুলকিত হইয়া উঠিল। তুলির লেখায় তাহা ফুটাইবার জন্য সে ব্যস্ত হইয়া উঠিল। তার চোখের এ মুগ্ধ ভাব লতিকার দৃষ্টি এড়াইল না, তার অন্তরে আনন্দের একটা তুফান বহিয়া গেল।

তার কাজ শেষ হইলে হরিচরণ বলিল, "এখন আপনার ছুটী।"

লতিকা ছুটিয়া হরিচরণের পিঠের কাছে আসিয়া তার মুখের কাছে মুখ দেখিতে লাগিল—আনন্দে তার চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

লতিকা বলিল, "বাঃ! কি সুন্দর!"

তার দিকে মুখ ফিরাইয়া হরিচরণ বলিল, "সুন্দর নয়? আপনার যে এত রূপ আছে, তা' আগে টের পাই নি।"

লতিকা বলিল, "আহা! আমার রূপ না আর কিছু—সুন্দর আপনার ছবি—আমি নই।"

বড় কাছাকাছি ছিল মুখখানা। হরিচরণের মাথাও খুব ঠিক ছিল না, সে লতিকার চিবুক ধরিয়া নাড়িয়া বলিল, "না গো না, তুমিই সুন্দর।"

এ আনন্দ কি ধরিয়া রাখা যায়? লতিকার সারা প্রাণ নাচিয়া উঠিল। কিন্তু তার বড় লজ্জা হইল। সে সোজা দাঁড়াইয়া বলিল, "দূর!"

সে ছুটিয়া পলাইল।

দিনের পর দিন এমনি করিয়া হরিচরণ লতিকার স্কেচ করিতে লাগিল। রূপ-বুভুক্ষুর দৃষ্টি দিয়া সে যতই লতিকার দিকে চায়, ততই তার চোখে ফুটিয়া উঠে লতিকার নূতন নূতন রূপ!

শুধু কি রূপ? রূপের এই একাগ্র সাধনায় সে লতিকার এত কাছাকাছি আসিয়া পড়িল যে, সে লতিকার অন্তরের স্পষ্ট সান্নিধ্য অনুভব করিতে লাগিল। যতই সে কাছে আসিল, ততই মুগ্ধ হইল। বড় মধুর কোমল, প্রীতিভরা সেবা-ভরা লতিকার চিত্ত! সেই নরম মনখানার ছাপ পড়িয়াই

তার মুখ অপূর্ব্ব শোভায় ভরিয়া উঠে। তার মনের সঙ্গে এই নিবিড় পরিচয়ে হরিচরণ ধীরে ধীরে তার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িল।

এ কথাও বুঝিতে তার বাকী রহিল না যে লতিকা তাকে ভালবাসে—অসীম মিথ্যা বলে নাই।

কিন্তু গরীব সে, নির্গুণ সে—লতিকাকে দিবার মত তার কিছুই নাই। একটা দীর্ঘঃনিশ্বাস ফেলিয়া তার নিঃস্বতার ব্যথায় সে মরিয়া গেল।

তাই লতিকাকে ভালবাসিবার কথা ভাবিতে সে ভয় পায়—কাঁদিয়া ওঠে তার অন্তর। সে গুম হইয়া ভাবে—ভাবে, তার ভাঙ্গাচোরা অদৃষ্টের সঙ্গে আর কারও অদৃষ্ট জড়াইবার তার অধিকার নাই।

বুক তার ভাঙ্গিয়া যায়।

লতিকার এ কয়দিন কাটিল একটা বিপুল আনন্দ উৎসবে। সে বুঝিল হরিচরণের চিত্ত আর তার প্রতি উদাসীন নয়—সেও তাকে ভালবাসে। এ আনন্দের বেগে সে আত্মহারা হইয়া গেল। আর কোনও কথা সে ভাবিতে পারিল না।

এমনি করিয়া হরিচরণের দপ্তর লতিকার শতাধিক সুন্দর স্কেচে বোঝাই হইয়া গেল। অসীমের ফরমায়েসী ছবিখানাও ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল।

তার সম্বন্ধে হরিচরণ মাঝে মাঝে অসীমের সঙ্গে পরামর্শ করিত,—অসীমের পরিকল্পনার সহায়তায় সে তার ছবি আঁকিত।

শেষে একদিন সে অসীমকে ডাকিয়া ছবি দেখাইল—তখন ছবি প্রায় শেষ হইয়াছে। ঢাকনাটা খুলিয়া ফেলিতেই অসীম আনন্দের উচ্ছ্বাসে বলিয়া উঠিল, "Bravo! চমৎকার! হরি ভাই—এটা Exhibitionএ দিতে হবে!

ম্লানমুখে হরিচরণ বলিল, "না ভাই, আর লাঞ্ছনার দরকার নেই। সুখের চেয়ে স্বস্তি ভাল। একবারেই অনেক শিক্ষা হয়েছে আমার।"

"আরে হতভাগা সেও ছবি, এও ছবি! কি বল লতিকা?"

লতিকা হাসিয়া বলিল, "আহা, আমি ছবির কিই বা বুঝি? আমার চোখে তো সব ছবিই সুন্দর লাগে।"

অসীম বলিল, "কি এ ছবি! দেখতে পাচ্ছ না কত সুন্দর! কি মুখখানা—আহা হা, যেন কথা কইছে—রূপ যেন ঝরে' প'ড়ছে! লতিকা, তুমি কি জানতে কখনও যে তুমি এত সুন্দর?"

লতিকা বলিল, "আমি সুন্দর না আর কিছু, উনি ওঁর মন থেকে এঁকেছেন তাই সুন্দর হ'য়েছে। আমার রূপ তো ঝ'রে পড়ে যখন আরসীর দিকে চাই।"

অসীম। কিন্তু আরসীর ছবির চেয়ে এ ছবি যে ঢের বেশী সত্যি। এর ভিতর হরি ফুটিয়েছে তোমার সেই রূপ যা তুমি নিজে কখনও জানো না, হয় তো চোখেও দেখ নি। না ভাই?

হরি। তা ঠিক! আপনার যে এত রূপ আছে সে আপনি জানতেন না ব'লেই রক্ষে, জানলেই এর চেহারা বদলে যেত।

লতিকা। যান, আপনারা দুজনে মিলে কি যে ঠাট্টা আরম্ভ ক'রেছেন তার ঠিকানা নাই। না হয় আমার রূপ নাই আছে—তা'বলে এমনি ঠাট্টা ক'রতে হয়।

সে একটু অভিমান করিল।

অসীম বলিল, "থুড়ি, রাগ কর তো আর বলবো না। কিন্তু মেয়ে-মানুষকে সুন্দর ব'ল্লে রাগ করে তা' এই প্রথম দেখলাম।"

হরিচরণ ও লতিকা হাসিয়া উঠিল।

অসীম বলিল, "যা'ক, এ ছবি তোমার একজিবিশনে দিতে হ'চ্ছে। তুমি না দাও আমি দেব।"

হাসিয়া হরিচরণ বলিল, "তা দেওগে তুমি। তুমি ছবির মালিক, তুমি একে ইচ্ছে ক'রলে আঁস্তাকুড়ে ফেলে দিতে পার।"

লতিকা কথাটা শুনিয়া একটু বিস্মিত হইল—সে জানিত না যে ছবি আঁকাইয়াছে অসীম। সে হরিচরণের মুখের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাহিল।

সে দৃষ্টির মর্ম্ম বুঝিয়া অসীম বলিল, "ছবির মালিক হচ্ছে লতিকা। তার নিজের চেহারার কপিরাইট তারই! তুমি কি বল? একজিবিশনে দেওয়া হবে না?"

লতিকা স্মিত-মুখে বলিল, "দিন না—বেশ তো!"

অসীম। এর পর আর কারও কথা চলে না। লতিকার যখন ইচ্ছে হ'য়েছে তার রূপটা দশজনে দেখে সুখ্যাত করুক, তখন এ ছবি পাঠাতেই হচ্ছে।

লতিকা। আহা, তাই বুঝি আমি বল্লুম?

অসীম। বলোনি বটে, কিন্তু কথাটা তো ঠিক।

লতিকা বলিল, "যান, আপনি অমন করেন তো আমি কোনও কথা কইব না আপনার সঙ্গে।"

অসীম। দোহাই লতিকা, তোমার না হয় কথা কইবার অন্য লোক আছে। তাই ব'লে আমাকে বঞ্চিত ক'রো না; আমার ওই সম্বল।

তারপর অসীম বলিল, "তোমাকে এত সুন্দর ব'ল্লাম, একটু চা খাওয়াবে না?"

লতিকা হাসিমুখে চা করিতে গেল।

অসীম বলিল, "ভায়া, ছবিতে কথা কয়, শুনেছ?"

"না, ছবির মুখের কথা শোনবার সৌভাগ্য আমার হয় নি।"

"দেখছো না এ ছবি কত কথা কইছে? এ ব'লছে যে তুমি এখন

লতিকাকে ভালবাস! ভাল না বাসলে ওর ভিতর এ রূপ তুমি দেখতে পেতে না, এত দরদ দিয়ে আঁকতেও পারতে না।"

একটু ম্লান হাসি হাসিয়া হরিচরণ বলিল, "ভাই, আমি ছবি আঁকি, কবিতা লিখি না। অত সব বুঝি না।"

"কবিতা তারাই লেখে যাদের জীবনে কাব্য লাভ করবার সৌভাগ্য হয় না। তোমার কবিতা তোমার রক্তের ধারায় বইছে—তাকে কলমের খোঁচায় খুঁড়ে তোলবার দরকার হয় না, তার সময়ও নেই তোমার।"

"যাক গে—ওসব বাজে কথায় কাজ কি ভাই? ভালবাসি বা না বাসি তাতে কি এল গেল। পাকা বেলের মাঝখানে ব'সলে কাকের কি লাভ?"

"কিন্তু মনে কর যদি বেল ফাটা হয়?

"ওসব ভাবনা ভাববার অবসর নেই আমার। আমি এইটুকু জেনে নিশ্চিন্ত হ'য়ে আছি যে, একটা পেট চালানই দায়, দুটোর কথা ভাববার কাজেই কোনও দরকার নেই।"

"কিন্তু এ স্থলে পেট চালাবার কথা না ভাবলেও তো চলে। লতিকা না হয় চাকরীই করবে।"

"থাম, দাদা, থাম। শুনতে পাবে। কি যে বকছো তার ঠিকানা নেই।"

ছবি একজিবিশনে পাঠাইয়া হরিচরণ একটু ব্যস্ত হইয়া বেড়াইতে লাগিল।

তার হঠাৎ বড় গবজ পড়িয়া গেল অর্থ উপার্জ্জনের। তার ভাঙ্গাচোরা অদৃষ্টকে জোড়াতালি দিয়া খাড়া করিবার জন্য সে অস্থির হইয়া উঠিল;—সে আবার স্বপ্ন দেখিতে লাগিল, সুখের সংসারের—যার অধিষ্ঠাত্রী হইবে লতিকা। "লতিকার মধ্যে ব'সে আছে বিশে!"

সে ঘুরিয়া ঘুরিয়া কাজের জোগাড় করিতে লাগিল। দিন রাত খাটিয়া ছবি আঁকিতে লাগিল।

লতিকার কাছে সে মুখ ফুটিয়া কোনও দিন কোনও কথা বলে নাই? কেন না, সে জানে তার পক্ষে প্রেমের কথা বলা ধৃষ্টতা। যদি ভগবান দিন দেন, আপনার পায় যদি সে একদিন দাঁড়াইতে পারে, তবে সে বলিবে—তার আগে নয়।

সে লতিকাকে বলিল, "দেখুন, আমার একটা আলাদা ঘর না নিলে চলছে না। এখানে তো লোক আসে না। সদর রাস্তার উপর একটা ঘর না নিলে আমার ব্যবসা চলবে না। দয়া ক'রে অনুমতি দিন যাবার।"

লতিকার কান্না পাইল, তাই সে কথা বলিতে পারিল না। শেষে হরিচরণ বুঝাইয়া পড়াইয়া তাকে সম্মত করিল। কিন্তু লতিকা বলিল, "বিশে'র মূর্ত্তিখানা টানাটানি করিয়া ভাঙ্গিবার কোনও দরকার নাই—সেটা লতিকার কাছেই থাকুক, আর হরিচরণের একবেলা লতিকার ওখানে রোজ খাইতে হইবে।

হরিচরণ এ ব্যবস্থায় খুসী হইল। সে একটা ঘর ভাড়া করিয়া বসিল সদর রাস্তার ধারে।

লতিকার দিন বড় কষ্টে কাটে। চিরদিন একলা থাকিয়াছে সে, তাতে কোন কষ্ট হয় নাই; কিন্তু এখন যেন তার সেই শূন্য ঘর তাকে গিলিতে আসে। হরিচরণ যে ঘরের কতখানি জুড়িয়া ছিল, তাহা সে বুঝিল সে চলিয়া গেলে।

হরিচরণ রোজ আসে—এইটুকুই তার এখনকার জীবনে প্রধান আনন্দ। তা ছাড়া অসীম আসে—তাতেও সময় কাটে বেশ। কিন্তু তবুও অনেকটা--প্রকাণ্ড ফাঁক থাকিয়া যায়।

হঠাৎ একদিন নিঃসঙ্গ সন্ধ্যায় এক নূতন অভ্যাগতের আগমন হইল। আজ সে নূতন, কিন্তু একদিন সে ছিল পুরাতন। আট মাস আগে তার সঙ্গে লতিকার ছাড়াছাড়ি হইয়া গিয়াছে।

যতীন ডাক্তারের সঙ্গে লতিকার অসঙ্গত রকম ভাব ছিল। প্রায় তিন চার বৎসর ডাক্তারের সঙ্গ লতিকা উপভোগ করিয়াছিল—কিন্তু হঠাৎ একদিন তার মনটা লতিকার প্রতি ভয়ানক বিরক্ত হইয়া উঠিল। তখন সে বিশে'র শুশ্রূষা করে, তার পর হরিচরণের ঘরে গিয়া তার সেবা করে। হরিচরণ ও বিশে'কে দেখিয়া তার মনটা কেমন বিরক্ত হইয়া গেল তার নিজের এ মেকী ভালবাসার উপর। কি ভালবাসে এরা স্বামী-স্ত্রী পরস্পরকে! ইহার পাশে যতীনের সঙ্গে তার সম্পর্কটা একেবারে খেলো মনে হইয়া গেল,—সে ইহাতে বিরক্ত হইয়া উঠিল।

তবু অনেক দিনের বন্ধন,—ছাড়ান দায়! তাই কিছুদিন সে কিছুই বলিল না।

যতীন ক্রমে বিরক্ত হইয়া উঠিল। একদিন তাকে অনুযোগ করিয়া সে বলিল, "তুমি কোথায় থাক? তোমার যে দেখাই পাওয়া দায়!"

লতিকা বলিল, "খেটে খাই, পরের চাকরী করি—কি ক'রবো?"

যতীন উষ্ণভাবে বলিল, "শুধু পরের চাকরী নয়—আর একটা কিছু হ'য়েছে। আমি যে একেবারে টের না পাই তা নয়।"

লতিকাও উষ্ণভাবে বলিল, "বেশ! হ'য়েছে তো হ'য়েছে!"

যতীন খানিকক্ষণ মুখ ভার করিয়া থাকিয়া বলিল, "তোমার মতলব-খানা কি বল দেখি। আমাকে এমনি ক'রে খেলিয়ে তোমার কি সুখ?"

"শুনতে চাও তবে? স্পষ্ট করেই বলছি। ঘেন্না ধ'রে গেছে আমার এ সবে। ভাল লাগে না কিছু। তোমাকে দেখলে আমার গা রী রী করে।"

ইহার পর খুব এক চোট ঝগড়া হইল। যতীনকে লতিকা বাড়ী হইতে বাহির হইতে বলিল—বলিল, আর যেন সে না আসে। যতীন গরগর করিয়া লতিকাকে গালিগালাজ করিয়া চলিয়া গেল।

তারপর আর সে আসে নাই। তার অভাব লতিকা কোনও দিন অনুভব করে নাই।

আজ হঠাৎ যতীনকে দেখিয়া লতিকা চমকাইয়া উঠিল। সে বলিল, "এ কি? তুমি? আবার?"

হাসিয়া যতীন বলিল, "যাচ্ছিলাম এধার দিয়ে—ভাবলাম একবার দেখে যাই তোমায়—for old time's sake,"

বিনা নিমন্ত্রণেই সে চেয়ার চাপিয়া বসিল। লতিকা বড় বিব্রত বোধ করিল—একটু ভয়ও তার হইল। কিন্তু মুখ ফুটিয়া যতীনকে কিছু বলিতে পারিল না।

যতীন বলিল, "তারপর—কি রকম চলছে দিন? খুব স্ফূর্ত্তি চলছে, কেমন?"

লতিকা ম্লানমুখে বলিল, "দিন যেমন চিরদিন চলে আসছে তেমনি চলছে। তোমাকে ছাড়া দিন চলা বন্ধ হয়ে গেছে এমন নয়।"

"না, তা হবে কেন ?—তা তোমাকে ছাড়াও আমার দিন চলছে।"

"আমি কি ব'লেছি তা চলবে না ?"

ভাবটা সেই রকমই মনে হ'য়েছিল সেদিন। আমি তোমাকে ছেড়ে যাই নি, তুমিই বিদায় ক'রে দিয়েছিলে।"

"কিন্তু ঝগড়াটা আমি সুরু করি নি।"

"যাক গে যাক, সে নিয়ে আর ঝগড়া ক'রে কি হবে এতদিন পরে। হয় তো আমারই দোষ হ'য়েছিল, না হয় তোমারই দোষ হ'য়েছিল। সে পুরানো কথা ঘেঁটে লাভ নেই।"

"না—আমারও ঘাঁটবার ইচ্ছে নেই।"

"তোমার যদি মনে হয় যে সে ঝগড়াটা না হ'লেই ভাল ছিল, তবে আমি এখনও সব ভুলে যেতে রাজী আছি। বল তো আমরা যেমন ছিলাম, তেমনি হ'তে পারি।"

লতিকা হাসিয়া বলিল, "কিন্তু আমার তেমন কোনও ইচ্ছেই নেই। ব'লেছি তো সেদিন, আমার ও-সবে ঘেন্না ধরে গেছে।"

"কিসে ! ভালবাসায় ? ভালবাসাটা কি এমনই খারাপ জিনিষ ?"

"ভালবাসা বল ওকে ? তুমি কোনও দিন ভালবাসা দেখ নি তাই ভাবছো যে তোমায় আমায় ভালবাসা ছিল। যদি জানতে তবে বুঝতে সে জিনিষ কি ?"

কৌতুকের দৃষ্টিতে লতিকার দিকে চাহিয়া যতীন বলিল, "ও, তাই না কি ? এর মধ্যে আবার ভালবেসে ফেলেছ—হুররে !"

"আমি ভালবেসেছি কি না সে খোঁজে তোমার দরকার নেই। আমি ভালবাসা দেখেছি—ভালবাসা চিনতে শিখেছি—"

হাসিয়া যতীন বলিল, "ওইটাই হ'ল নূতন ভালবাসার symptom। একজনকে ছেড়ে আর একজনকে ভালবাসলেই সবাই মনে করে, আগেকার ভালবাসাটা ছিল মেকী, এইটেই আসল। কিন্তু কয়েক দিন বাদে এই আসলও মেকী হ'য়ে যায়—যদি আর কেউ জুটে পড়ে !"

লতিকা রাগ করিয়া বলিল, "যাও, আমি তোমার সঙ্গে এ সম্বন্ধে কথা কইতে চাই নে।"

"তা না চাইলে। আমারও গরজ নেই। তোমার নূতন ভালবাসার

জয় হোক, আমার তাতে কোনও দুঃখ নেই। এই আমি তোমার নূতন ভালবাসার মঙ্গল কামনায় drink ক'রছি।"

বলিয়া ফস্ করিয়া পকেট হইতে ফ্লাস্ক বাহির করিয়া যতীন কয়েক ঢোঁক মদ খাইয়া ফেলিল। লতিকা বিরক্ত হইয়া ভ্রূকুটি করিল।

লতিকা বলিল, "আচ্ছা, এখন হ'য়েছে। বিদায় হও এখন। অতগুলো গিললে, এখুনি তো মাতলামি সুরু হবে। আমি তো তোমাকে জানি।"

"না, না, অত ভয় ক'রো না। অত চট্ ক'রে এখন আমি মাতাল হই নে। শোন, তুমি অন্য লোক পেয়েছ, আমার তাতে দুঃখ নেই—I wish you all joy-হুরে! Three cheers for your love—হিপ্ হিপ্ হুরে হিপ্ হিপ্ হুরে!"

লতিকা বুঝিল, মদ যতীনের মাথায় চড়িয়া বসিয়াছে। সে এখানে আসিবার পূর্ব্বেই কিছু খাইয়াছিল, ক্রমে তার ক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছে। সে তাড়াতাড়ি ইহাকে বিদায় করিবার জন্য ব্যস্ত হইল। কিন্তু সে যতই যতীনকে উঠিতে বলে, ততই সে চাপিয়া বসে।

অনেক কষ্টে শেষে সে যতীনকে দাঁড় করাইল। যতীন বলিল, "আমাকে ভালবাস না তুমি কোনও দুঃখ নেই তাতে—যাকে ভালবাস তার ওপর—সত্যি বলছি—কোনও রাগ নেই। কিন্তু—for old time's sake—let us be friends."

লতিকা বলিল, "না, না, আর ফ্রেণ্ডে কাজ নেই আমার।"

"চাও না—friendship চাও না আমার? কুচ্ পরোয়া নেই।" বলিয়া সে গট মট করিয়া টলমল করিতে করিতে অগ্রসর হইল। কয়েক পা গিয়া সে পড়িবার মত হইল। লতিকা তাকে ধরিয়া লইয়া চলিল।

চলিতে চলিতে যতীন আবার ফিরিয়া বলিল, "অন্ততঃ let us part as friends—" বলিয়া সে হাত বাড়াইয়া লতিকার হাত ধরিয়া ঝাঁকাইল। তারপর হঠাৎ লতিকাকে ধরিয়া চুম্বন করিয়া বলিল, "কিছু মনে ক'রো না—for old time's sake."

হরিচরণ সেই সময় লতিকার কাছে আসিতেছিল। বাহিরের ক্ষীণ আলোকে দাঁড়াইয়া সে এই দৃশ্য দেখিল। সে স্তম্ভিত হইয়া গেল। এক মুহূর্ত্ত সে দাঁড়াইয়া রহিল।

লতিকা যতীনকে ধরিয়া বাহিরে আনিয়া হরিচরণকে দেখিতে পাইল। তার সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল।

সে যতীনের হাত ছাড়িয়া মাথা নীচু করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

হরিচরণ তার দিকে একবার চাহিল। অপরিমেয় বেদনায় তাহার অন্তর ভরিয়া গেল।

যতীন হরিচরণের দিকে চাহিয়া মত্তকণ্ঠে বলিল, "ইনি ?—ইনি তোমার নূতন lover ? good ! wish you joy !" বলিয়া সে হরিচরণের দিকে হাত বাড়াইল।

কোনও কথা না বলিয়া হরিচরণ মুখ ফিরাইয়া চলিয়া গেল। লতিকা তেমনি দাঁড়াইয়া রহিল।

১৮

অসীমের চেষ্টার ফল ফলিয়াছে। হরিচরণ লতিকাকে ভালবাসিয়াছে। তিল তিল করিয়া সে ভালবাসা তার চিত্ত ছাইয়া ফেলিল। সে ভাবিয়াছিল, বিশে' যখন গিয়াছে তখন তার ভালবাসারও শেষ হইয়া গিয়াছে। যখন পায় পায় এ নূতন ভালবাসা তার অন্তর জয় করিতেছিল, তখন সে মনকে বুঝাইয়াছে যে, ভাল সে কাউকে আর বাসিবে না—এ সব তার ক্ষণিক দুর্ব্বলতা! কিন্তু একদিন সে আর আপনাকে বঞ্চনা করিতে পারিল না।

তাতে তার মনে স্বস্তি রহিল না। ভাল সে বাসিল, কিন্তু যাকে ভালবাসে তাকে সে তো পাইবে না; দরিদ্র সে, অন্নের কাঙ্গাল সে! কোনও দিন যে লক্ষ্মী মুখ তুলিয়া চাহিবেন, স্ত্রী-পুত্র লইয়া সংসারী হইবার শক্তি তার হইবে, সে আশা করিতে তার ভরসা নাই। তাই ভালবাসিয়াও সে চুপ করিয়া রহিল। চাল নেই, চুলো নেই যার, সে কোন্ মুখে লতিকাকে বলিবে তার জীবনের সঙ্গিনী হইতে। তাই ভালবাসিয়াও মুখ ফুটিয়া সে সে-কথা বলিতে পারিল না। বুক তার ফাটিয়া যাইত দুঃখে, কিন্তু সে দুঃখ শুধু ফুটিয়া উঠিত হতাশার গোপন নিঃশ্বাসে।

একটা ক্ষীণ আশা তার ছিল, এত ক্ষীণ যে তার দিকে ভাল করিয়া চাহিতেও তার ভরসা হইত না। অনেক গুঁতা খাইয়া তার ভরসার মুখ ভোঁতা হইয়া গিয়াছিল। তাই মনের আশেপাশে যে আশার রেখা ঝিকমিক করিয়া যাইত তার পানে সে ফিরিয়া চাহিত না। সে আশা—লতিকারই ওই ছবি।

অসীমের কথায় ছবিখানা সে একজিবিশনে দিয়াছে। বিচারকদের চোখে তাহা লাগিবে কি? যদি লাগে? যদি এ ছবির জন্য সে একটু খ্যাতি অর্জ্জন করিতে পারে, তবে তো তার এ দুর্দ্দশা থাকিবে না! তার মত অনেক চিত্রকর দেশে অনাহারে মরিয়াছে সত্য, কিন্তু যার একটু নাম পড়িয়া গিয়াছে, সে তো বসিয়া নাই। একবার যদি তার ছবি

একজিবিশনে পুরস্কার পায়, তবে আর দুঃখ থাকিবে না। কিন্তু পুরস্কার সে পাইবে কি ?

এ কথা সে ভাবে—বারবার অতি গোপনে সে ভাবে। ভাবে, যদি তাই হয়, তবে তো সে লতিকাকে অনায়াসে বিবাহ করিতে পারিবে! পুরস্কারের খ্যাতি ও উপার্জ্জনের সচ্ছলতা লইয়া যদি সে লতিকাকে বিবাহ করিতে চায়, তবে লতিকা তাতে অস্বীকৃত হইবে না।

তাই সে একজিবিশনে যায়। রোজ সে যায়, অনেকক্ষণ ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখে আর নিজের ছবিখানার সামনে দাঁড়াইয়া পরীক্ষকের দৃষ্টি দিয়া চাহিয়া দেখে। মনে হয়—মন্দ তো হয় নাই। আর সব নামজাদা ছবির পাশে তার ছবি তো তুচ্ছ হইবার মত নয়। আশা বাড়িয়া উঠে—আবার ভয় হয়।

সেদিন একজিবিশনে গিয়া সে এমনি তার ছবিখানার সামনে দাঁড়াইয়া নিরীক্ষণ করিতেছিল। কয়েকজন লোক আসিল, সে একটু সরিয়া দাঁড়াইল। একজন আর একজনকে বলিলেন, "এবারকার একজিবিশনে ছবির মত ছবি এই একখানা; আর সব শুধু মামুলী।"

হরিচরণের বুকের ভিতর হাতুড়ী পিটিতে লাগিল—আনন্দের উচ্ছ্বাস সে লুকাইয়া রাখিতে পারে না—বুক ফাটিয়া সে বাহির হইতে চায়।—যিনি এ অভিমত প্রকাশ করিলেন, তিনি দেশের একজন শ্রেষ্ঠ চিত্রজ্ঞ—আর্টিষ্টের অগ্রণী!

উল্লাসে নৃত্য করিতে করিতে হরিচরণ বাহির হইয়া আসিল। তার আনন্দ রাখিবার ঠাঁই নাই। তার অবজ্ঞাত ভবিষ্যৎ এক মুহূর্ত্তে সোনার রঙে রঙীন হইয়া উঠিল। সে স্বপ্ন দেখিতে লাগিল। এই চিত্রের খ্যাতি তার যে পরম সৌভাগ্যের সূত্রপাত্র করিবে, তার ধারাবাহিক চিত্র তার মনের ভিতর খেলিয়া গেল—সে সবের কেন্দ্রে রহিল লতিকা—প্রিয়তমা লতিকা—গৃহপত্নী লতিকা—লক্ষ্মীর অবতার লতিকা।

ফাল্গুনের ঝিরঝিরে হাওয়ায় যেন তার শীতে-জমাট-বাঁধা অন্তর গলিয়া তার উপর পুলকের হিল্লোল বহিয়া গেল। অধীর হইয়া সে ছুটিয়া গেল ময়দানে। সেখানে নির্জ্জনে বসিয়া সে অনেকক্ষণ তার মনোরম স্বপ্ন উপভোগ করিল।

ইহার পর আর দ্বিধা করিবার কি আছে? তার পুরস্কার সুনিশ্চিত! তবে আর বুকভরা ভালবাসা চাপিয়া দম ফাটাইবার কি প্রয়োজন আছে? সে স্থির করিল, আজই সে লতিকাকে তার প্রেম নিবেদন করিবে।

পথে ফিরিতে ফিরিতে সে যে কথা বলিবে তার নানা রকম মুসাবিদা করিল। আর কথাটা শুনিয়া লতিকা কি বলিবে তার নানা কল্পনা তার মাথার উপর খেলিতে লাগিল। সেই সব কল্পনা উপভোগ করিতে করিতে সে ছুটিল তার প্রণয়ের দৌত্যে।

লতিকার গৃহদ্বারে আসিয়া সে যাহা দেখিল তাহাতে তার মাথায় বজ্রাঘাত হইল। এক মুহূর্ত্ত সে সেখানে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল; তারপর সে ছুটিয়া পলাইল।

সে অনেক জায়গায় ছুটাছুটি করিল—কোনও খানে সুস্থির হইতে পারিল না। মনের ভিতর রাবণের চিতা জ্বালিয়া অনেকক্ষণ সে কলিকাতার পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইল।

তার মনে হইল, এমনি করিয়া অতল গহ্বরে ফেলিয়া দিবার জন্য তাকে আশার একটা তুঙ্গ চূড়ায় না উঠাইলেই কি চলিতেছিল না ভগবানের? দুঃখ দিয়া তার অন্তর জর্জ্জরিত করিয়া তাঁর আশা মিটিল না, তার সুখের জীর্ণ কঙ্কালের উপর এমনি কঠোর আঘাত করিয়া তাকে চূর্ণ না করিলেই কি চলিত না? নিষ্ঠুর বিধাতার কঠোরতার ভিতর এই সূক্ষ্ম কারচুপির এত কি প্রয়োজন ছিল?

অসীম ঠিক বলিয়াছে, ভগবান নাই—যাহা আছে সে একটা বিরাট দানব! শুধু দশমুখে সে মানবের সুখের সঞ্চয় গ্রাস করিয়া বিকট অট্টহাস্য করিতেছে। মুগ্ধ মানব অন্ধের মত তবু তার পায় লুটাইয়া কাঁদিতেছে তার করুণার প্রতি একটা অন্ধ বিশ্বাসে! মানুষ শুধু এই দানবের খেলার পুতুল!

লতিকা! অমনি চিত্তহারিণী, স্নেহময়ী, দয়াময়ী—বুঝি-বা প্রেমময়ী লতিকা—সে এই! সব তার অভিনয়—সব খেলা! এতদিন হরিচরণ তার যে মায়ামূর্ত্তি তিল তিল করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছিল, পলে পলে তার চরিত্রের বিন্দু বিন্দু সঞ্চয় করিয়া সে যে কোমল করুণ পবিত্র অন্তরের মহোদধি রচনা করিয়াছিল, সে শুধু একটা শূন্য! তার ভিতর কি একফোঁটা সত্য নাই!

ভাবিতে মন ভাঙ্গিয়া গেল। তার মনোময়ী প্রতিমার ওই ভগ্নস্তূপের দিকে চাহিয়া তার অন্তর ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল! মনে হইল নিষ্ঠুরভাবে বঞ্চিত হইয়াছে সে—এ বঞ্চনার একটা তীব্র প্রতিশোধ লইবার জন্য সে চঞ্চল হইয়া উঠিল।

অবশেষে সে অসীমের কাছে গেল।

* * * *

অসীমের জীবনে দুই দিন হইল একটা গুরুতর বিপ্লব হইয়া গিয়াছে, এ কথা তার বন্ধু-বান্ধবের সকলেই বুঝিতে পারিয়াছিল; কিন্তু কেন যে এমন হইল তাহা কেহ জানিল না।

হঠাৎ যেন তার জীবনটা বিস্বাদ হইয়া গেল। এতদিন সে মেসে বাসা বাঁধিয়া দিব্য আনন্দে কাটাইয়াছে, উড়িয়া ঠাকুর ও মেদিনীপুরের ঝি মিলিয়া যে সব অখাদ্য রচনা করিত, তাহা অম্লান-বদনে গলাধঃকরণ করিতে করিতে সে রহস্য করিত বিশ্বস্রষ্টার সঙ্গে। চোখা চোখা বাক্যবাণে ভগবানকে বিঁধিয়া বন্ধু-মহলে কাহাকেও বা ক্ষেপাইত, কাহাকেও চমকাইয়া দিত, কাহাকেও হাসাইত। বাহিরে যাইত, তারই মত দুঃস্থ সাহিত্যিক ও আর্টিষ্ট বন্ধুদের সঙ্গে গল্পগুজব আলাপ আলোচনা করিয়া পুলকিত হইত। আর আপনার ঘরের ভিতর স্তূপীকৃত অপরিচ্ছন্নতা ও অস্বাচ্ছন্দ্যের ভিতর নির্লিপ্ত আনন্দের বেগে অপূর্ব্ব রসসাহিত্য সৃষ্টি করিত।

অসীম জানিত যে সে যাহা লেখে তা' বাজার চলন সাহিত্যের চেয়ে অনেক শ্রেষ্ঠ। লোকে তার লেখার প্রশংসা করে, কিন্তু পড়ে না। তার লেখার ভিতরকার ভয়ানক ভয়ানক সৃষ্টিছাড়া কথায় লোকের আতঙ্ক হয়, আর তার আগাগোড়া যে একটা হাল্কা শ্লেষের সুর, বিশ্বের উপরে যে একটা রহস্যভরা অবজ্ঞা লুকান থাকে, তার রস কেহ বোঝে না। সকলে আলোচনা করে তার গল্পের ভিতর কোথায় কি অন্যায় আছে, এই সব কথা। অসীমের লেখা লইয়া আলোচনা হইত সর্ব্বত্র, কিন্তু তার রসবোধ হইত অতি অল্প। অসীম এ-সব আলোচনার কথা শুনিয়া হাসিত, বলিত, "এঁরা সব রসের ডুবুরী; কিন্তু সৈকতটুকু পেরিয়ে সাগরে যাবার সাহসও নেই, শক্তিও নেই। তাই চড়ার বালির উপর খালি গড়াগড়ি খাচ্ছেন আর বলছেন, সব বালি।"

তার বন্ধুদের মধ্যে কেউ কেউ বলিত, "এতটা স্পর্দ্ধা ভাল নয় ভায়া। জগতের মতটাকে অতটা তুচ্ছ না ক'রে সেটা নিজের সংশোধনের চেষ্টায় লাগালে ভাল হয়।"

অসীম বলিত, "ভাল নয় ব'লে হাসবো না? ভাল-মন্দ হিসাব ক'রে লোকে হাসেও না, কাঁদেও না? হাসি পায় তাই হাসে, কান্না পেলে কাঁদে। এ-সব স্বভাব দাদা, স্বভাব। যেটা সাদা, আমাকে চাবুক মেরে তাকে কালো বলাতে পারবে না—এ স্পর্দ্ধাকে তোমরা যতই তিরস্কার ক'রবে সে ততই বেড়ে যাবে।"

"তুমি কি বলতে চাও তুমিই পৃথিবীর একমাত্র সমজ্‌দার?"

"কোনও দিন বলিনি সে কথা—ভাবিও নি। বরং নিজেকে খাটো ক'রেই বরাবর দেখে এসেছি। কিন্তু এমনি সমালোচনা যদি আর কিছুদিন চলে তবে ঠিক জানবো যে বাস্তবিকই আমি একমাত্র সমজ্‌দার। জান তো, সক্রেটিসকে একদিন একজন খোসামুদী ক'রে ব'লেছিল যে, তিনি এথেন্সের মধ্যে সব চেয়ে জ্ঞানী লোক। সক্রেটিস ব'লেছিলেন, দূর, আমি কিই বা জানি! জ্ঞানী লোক জানে যে তার জ্ঞানের চেয়ে অজ্ঞান কত প্রকাণ্ড বড়—তাই তার এ বিনয় আপনি হয়। তারপর সক্রেটিস গেলেন সব নামজাদা পণ্ডিতদের সঙ্গে আলোচনা ক'রতে। সবার কাছে ঘুরে ঘুরে আলোচনা ক'রে দেখলেন যে, সেই সব পণ্ডিতেরা কেউ কিছু জানে না; কিন্তু তাদের মনে বিশ্বাস যে, তারা সব জানে। তখন তিনি বল্লেন যে, লোকটা ব'লেছিল ঠিক,—আমিই এথেন্সের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী; কেন না এরা কেউ কিচ্ছু জানে না,—জানে না যে—সে কথাটাও জানে না! আমিও এদেরই মত কিছুই জানি না, কিন্তু আমি জানি যে, আমি জানি না। এইটুকুতেই আমি শ্রেষ্ঠ। যত দিন যাচ্ছে ভাই, আমারও তেমনি মনে হ'চ্ছে। তোমাদের বড় বড় সমজ্‌দারদের সমজানর দৌড় দেখে আমারও একটু অভিমান গজাচ্ছে যে আমি তাদের চেয়ে বড়—সে আমার গুণে নয়, তাদের দোষে। সত্যি সত্যি আমি একটা বড় রসজ্ঞ নই, কিন্তু এঁদের চেয়ে বড়।"

বন্ধু বলিল, "বুঝেছি—তোমার মাথাটা বেজায় ভারী হ'য়ে উঠেছে—এর ফল পাবে।"

"ফল অবিশ্যি পাব, কিন্তু ফলটা যে কি হ'বে, তা তোমাদের সেই বুড়ো ভদ্রলোকটিও জানেন না। তবে আশা করি এই সব সমজ্‌দারদের খুসী ক'রে তাঁদের প্রশংসা পাব এমন দুর্গতি আমার হবে না!"

এই অতিরিক্ত স্পর্দ্ধায় মুখ বাঁকাইয়া বন্ধুরা একে একে তাকে ছাড়িয়া গেল। অসীমের খ্যাতি বাড়িতে লাগিল, উপার্জ্জনও বাড়িয়া চলিল; কিন্তু তার নিন্দার পরিমাণ দুইটাকেই ছাড়াইয়া গেল। যারা তার অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল, তারাও জোট বাঁধিয়া তার নিন্দা করিতে লাগিল। কেন না, হোক সে বন্ধু,—তবু সে তাদের ছাড়াইয়া এতটা উঁচু হইয়া যাইবে, ইহাও কি সহ্য করা যায়?

অসীম হাসে আর সম্পূর্ণ বেপরোয়া হইয়া তার ঘরে বসিয়া কলম চালায়। যতই সে লেখে ততই তার শত্রুর দল বাড়িয়া যায়—তাতে তার আরও হাসি পায়।

যা লেখে, তার উচিত মূল্য সে পায় না, এ কথা অসীম বরাবরই জানে। যখন সে তার একখানা ভাল উপন্যাস একদিন দুই শত টাকায় কপিরাইট-সহ বেচিয়া আসিল, তখন তার এক বন্ধু অবাক্‌ হইয়া বলিল. "কি idiot তুমি, ওই বই বেচলে দু'শো টাকায়, এ যে জলের দরও হ'ল না।"

"দরটা তো আমার বইয়ের নয় ভাই, এটা হ'চ্ছে আমাদের দেশবাসীর মস্তিষ্কের পরিমাণ। আমার বই যখন কম দামে নিতে চায়, তাতে বইয়ের অগৌরব হয় না,—লজ্জার কথা হয় তাদের যারা মিছরীর—চাই কি বাগ-বাজারের রসগোল্লার—আর মুড়ির মর্য্যাদার তফাৎ বোঝে না। অন্ধের কাছেই যখন ছবি বেচতে হবে, তখন সে যা দেয় সেইটাই লাভ, কেন না, তার কাছে সব ছবিরই যে এক দর—অর্থাৎ কাণাকড়িও নয়।"

"না, না, ও সব বাজে কথা, তোমার পাবলিশার তোমায় ঠকাচ্ছে।"

"কিন্তু আমাকে জেতাবার মত পাবলিশার যেকালে নেই, সেকালে ঠকাই যে আমার লাভ। নইলে লেখাগুলো বস্তাবন্দী ক'রে রাখলে তাতে পয়সা তো আসবেই না, সেই বস্তার ভিতর আমার আত্মা ছট্‌ফটিয়ে ম'রবে। লিখবো অথচ লেখা ছাপা হ'বে না, এটা যে কত বড় দুঃখ, সে তো জান না ভায়া?"

এমনি হাল্কাভাবে সব দুঃখ তুচ্ছ করিয়া নির্লিপ্ত আনন্দে সে দিন

কাটাইয়াছে। একদিন তাকে কেহ রাগিতে বা দুঃখ করিতে দেখে নাই, একদিন তার ভ্রূ কুঞ্চিত হয় নাই।

তার পাওনাদারের অবধি নাই, কেন না, খরচ করিতে সে মুক্তহস্ত। টাকাটা হাতে আসিলেই সেটা খরচ করাই চাই। যদি তখন পাওনাদারেরা কেউ উপস্থিত থাকে, সে তাদের সৌভাগ্য—না থাকে, টাকা খরচ হইয়াই যায়—একদিন একজন তাকে বলিয়াছিল, "এই সেদিন একশো টাকা পেলে তা থেকে দেনাগুলো দিয়ে ফেল্লেই পারতে। নাহক এদের তাগাদা সহ্য কর কেন বল দিকিনি?"

অসীম বলিল, "পাওনাদারেরা আমার মূর্ত্তিমান দুর্ভাগ্য। তারা যখন চোখের সামনে থাকে, তখন তাদের অস্বীকার ক'রতে পারি না। তাই বলে' যখন তারা থাকে না, তখনও তা'দের বোঝা মনের ভিতর ব'য়ে বেড়াব, এতবড় বেকুব আমি নই। যখন এরা তাগাদা করে না, তখন আমি ভাবি এরা নেই; তাইতেই না অদৃষ্টকে ফাঁকি দিয়ে গোটাকয়েক আরামের মুহূর্ত্ত উপভোগ করি!"

কোনও কিছুই সে কোনও দিন গায়ে মাখে না। ভালবাসিতে গিয়া যখন সে ঠকিয়া ফিরিয়াছে, তখনও সে হাসিমুখে বলিয়াছে, "to fresh fields and pastures new". এমনি করিয়া সে সরমার কাছে, অনীলার কাছে, উত্তমার কাছে প্রেম নিবেদন করিয়া আশাহত হইয়া ফিরিয়াছে, কিন্তু তবু দমিয়া যাই নাই। লতিকার কাছেও সে প্রেম লইয়া গিয়াছিল। যখন দেখিল সে হরিচরণকে ভালবাসে, তখন সে তার অভ্যাসমত সরিয়া দাঁড়াইয়াছিল। এখানেও সে আশাভঙ্গে ম্লান হইয়া যায় নাই, হাসিমুখে দাঁড়াইয়া, হরিচরণকে সামনে দাঁড় করাইয়াছিল। নিজে চেষ্টা করিয়া হরিচরণকে লতিকার হাতে তুলিয়া দিয়াছিল।—তবু—

দিন দিন পরীক্ষা করিয়া সে দেখিল তার চেষ্টার ফল ধরিয়াছে। হরিচরণ লতিকাকে ভালবাসিয়াছে, লতিকা তো হরিচরণকে ভালবাসেই। যে দিন সে নিশ্চয় জানিল দুজনে দুজনকে ভালবাসে, সেদিন সে মনে মনে বলিল, "Bravo!" আর আনন্দ করিয়া হোটেলে গিয়া দুই পেগ হুইস্কি খাইয়া ফেলিল।

এ ব্যাপারের আগাগোড়াই তার মনের চারিধারে একটা ছায়া

ঘোরাফেরা করিত; কোনও দিনই সে ঠিক তার অভ্যস্ত নির্লিপ্ততার সহিত তার ভগ্ন আশা মন হইতে ঝাড়িয়া ফেলিতে পারে নাই। আজ তার অনভ্যস্ত এই ছায়ায় হঠাৎ মন আচ্ছন্ন হইয়া গেল। দ্বিতীয় পেগের গেলাসটি হাতে ধরিয়া বসিয়া অসীম নিবিষ্টভাবে অনেকক্ষণ তার দিকে চাহিয়া রহিল। তার মুখ ভার—অন্ধকার; বুকের তলায় কি যেন একটা তোলপাড় করিতেছে।

হরিচরণের হাতে লতিকাকে সে তুলিয়া দিয়াছে। ভাবিয়াছিল ইহা তার প্রাণে সহিবে। যেমন লঘু অবজ্ঞার সহিত জীবনের দুঃখকষ্ট সে বুকের ভিতর হইতে কাচিয়া ফেলিয়া দিয়াছে, তেমনি এ ব্যথাটাকেও ছুঁড়িয়া ফেলিতে পারিবে। কিন্তু প্রাণের ভিতর মোচড় দিয়া ব্যথাটা জানাইয়া দিল যে সে যাইবার নয়! এতদিন যে সংসার-সাগরের উপর নিশ্চিন্ত মনে ভাসিয়া বেড়াইয়াছে,—আজ সে বুঝিল এক জায়গায় লুকান শিকলে তার পা বাঁধিয়া গিয়াছে। জীবন-সূত্রে তাল পাকাইয়া এ পর্য্যন্ত অনেক গাঁট সে ফেলিয়াছে; কিন্তু সূতা ধরিয়া টান দিতেই সে সব গ্রন্থি সরল হইয়া গিয়াছে। আজ তাতে এমন একটা গাঁট পড়িয়াছে, যাহা খুলিবার শক্তি বুঝি তার নাই।

সে আগেও ভালবাসিয়াছে। ভালবাসা তার হৃদয়-সরোবরে শেওলার মত গজায়; তার প্রয়োজন মিটিয়া গেলে তাকে অনায়াসে তুলিয়া ফেলা যায়—ইহাই সে জানিত। কিন্তু আজ সে দেখিতে পাইল যে, লতিকার প্রতি তার ভালবাসা তেমন নয়—সে একটা প্রস্ফুট শতদল—তার শিকড় বসিয়া আছে তার বুকের ভিতর। আজ সে শিকড় ধরিয়া টান পড়িয়াছে, তাই তার চিত্ত ব্যথাতুর হইয়া উঠিয়াছে।

"দুত্তোর!" বলিয়া সে গেলাস লইয়া জোর চুমুক লাগাইল। দ্বিতীয় পেগ নিঃশেষ হইয়া গেল। সে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। বয় আসিয়া বোতল তুলিয়া ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আর এক পেগ?"

অন্যমনস্কভাবে অসীম ইঙ্গিত করিল, বয় আর এক পেগ ঢালিয়া দিল।

অসীম লতিকাকে মিথ্যা বলে নাই। সে মদ খায়। কিন্তু মাতাল হইবার মত খায় না। দুই পেগের বেশী সে কোনও দিনই খায় না। কিন্তু আজ দুই পেগ নিঃশেষ করিয়াও তার শরীরটা তাতাইয়া উঠিল না।

মনের ভিতরকার গভীর বিষাদের চাপে হুইস্কী একেবারে ব্যর্থ হইয়া গেল, নেশার আমেজটুকুও আসিল না।

গম্ভীর মেঘাচ্ছন্ন মুখে একটা অপ্রিয় কর্ত্তব্যের মত করিয়া অসীম তৃতীয় পেগ খাইয়া নিঃশেষ করিল। যতই সে খাইতে লাগিল, ততই তার অন্তর বিষাদে আচ্ছন্ন হইয়া উঠিল।

জীবনে তার যাহা কখনও হয় নাই আজ তাই হইল। অসীমের কান্না পাইল। সুস্থ চিত্তে সে যে দুঃখকে হয় তো শ্লেষের আগুনে পোড়াইয়া ফেলিতে পারিত, তার সুরাভিভূত চিত্তে সে দুঃখ তার সমস্ত অন্তর লইয়া তোলপাড় করিতে লাগিল।

দারুণ ব্যথার বোঝা বহিয়া সে তার মেসে ফিরিয়া আসিল। অন্ধকার ঘরে আসিয়াই তার মনটা ক্ষেপিয়া গেল। বিরক্তভাবে পকেট হইতে দেশলাই বাহির করিয়া জ্বালিল। সমস্ত ঘরের কুশ্রী অপরিচ্ছন্ন মূর্ত্তি তার চোখের সামনে একটা কদর্য্য বিভীষিকার মত দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। ভ্রূকুটি করিয়া সে মুখ ফিরাইল।

দেখিতে পাইল তার ল্যাম্পে তেল নাই। আরও বিরক্ত হইয়া উঠিল। দেশলাই কাঠিটা ফেলিয়া দিয়া দুই পায় তাকে অযথা মাড়াইতে লাগিল—যেন ওই তুচ্ছ কাঠিটা তার মূর্ত্তিমান হতভাগ্য। তার পর সে তার বিছানার উপর শুইয়া পড়িল।

শুইয়াই অনুভব করিল তার বিছানাটা পাতা হয় নাই, তার উপর বই, কাগজ, পেনসিল ইত্যাদি রাশি রাশি অনাবশ্যক জিনিস ছড়ান রহিয়াছে। ক্ষিপ্ত হইয়া সে হাতের গোড়ায় যাহা পাইল, দুমদাম করিয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া কোনও মতে তার শুইবার মত জায়গা করিয়া লইল। চিৎ হইয়া সে তার দুর্ভাগ্যের কথা ভাবিতে লাগিল।

আজ তার মনে হইল—জগৎ তার উপর নিদারুণ অবিচার করিয়াছে। তার শক্তির যোগ্য বেতন সে পায় নাই,—অবহেলা করিয়া জগৎ তাকে দিয়াছে শুধু মুষ্টিভিক্ষা! মেসের এই তুচ্ছ গৃহের অপ্রচুর আয়োজনের ভিতর অস্বচ্ছন্দতার জীবন এখন তার একটা দুঃসহ অভিশাপ বলিয়া মনে হইল। মনে হইল, তার এ দুর্দ্দশার একমাত্র কারণ এই যে, তার দেশবাসী তার গুণের সমাদর করিতে জানে না। সমস্ত সংসারের উপর

সে ক্ষেপিয়া উঠিল। তাহার কোনও সঙ্গত হেতু তার মনে হইল না। যে জগৎ তার প্রতিভার এতবড় অসম্মান করে তার উপর সে মর্ম্মান্তিক চটিয়া গেল।

অদৃষ্টের এ নির্ম্মম নির্য্যাতন সে এতদিন একটা পরিহাস বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছে। জগতের এ তীব্র অনাদর সে দর্পের সহিত অবজ্ঞা করিয়াছে। কিন্তু আজ হঠাৎ ইহা তার বুকের ভিতর বিষের ছুরির মত বসিয়া গেল—আজ সে তার অভ্যস্ত শান্ততার সহিত ইহাকে সম্ভাষণ করিতে পারিল না।

অনেকক্ষণ বিছানায় পড়িয়া থাকিয়া সে উঠিল। পায়ে একটা কি ঠেকিল—লাথি মারিয়া তাহা দূরে ছুঁড়িয়া ফেলিল,—কাচের গেলাসশুদ্ধ জলের কুঁজো চুরমার হইয়া ঘর জলে ভাসিয়া গেল। হাতড়াইয়া দুয়ারের দিকে অগ্রসর হইতে গিয়া চেয়ারটায় হঠাৎ ধাক্কা খাইল—চেয়ার তুলিয়া আছাড় মারিল ;—একটা পায়া ভাঙ্গিয়া গেল। ক্রমশঃই তার মাথা গরম হইয়া উঠিল। বাহির হইয়া ঝিকে খানিকক্ষণ ডাকাডাকি করিল, কোনও সাড়া পাইল না। ঝির উদ্দেশে অকথ্য গালিগালাজ করিতে করিতে সে বোতল হাতে করিয়া দোকানে চলিল, কেরোসিন তেল কিনিতে।

পথে বাহির হইয়া সে তেলের বোতলটা ছুঁড়িয়া ফেলিল। খানিক দূরে একটা মদের দোকান ছিল, সেখানে ঢুকিয়া পড়িল। এক বোতল মদ কিনিল। পথে এক বাণ্ডিল চর্ব্বিবাতি কিনিল,—দুই বোতল সোডা কিনিল। তারপর ঘরে আসিয়া বাতি জ্বালিল। বোতল খুলিয়া মদ ঢালিল, সোডা ঢালিল, যতক্ষণ জ্ঞান রহিল সে অনবরত মদ খাইতে লাগিল। তারপর অচেতন হইয়া বিছানায় এলাইয়া পড়িল।

পরের দিন অনেক বেলায় ঘুম ভাঙ্গিল। মনটা ভারি অবসন্ন—শরীর ক্লান্ত ও অসুস্থ বোধ করিল। কোনও মতে মুখ হাত ধুইয়া চা করিবার আয়োজন করিল।

স্পিরিট ষ্টোভটা জ্বালিয়া তার উপর জল চড়াইতে গিয়া সে হঠাৎ "দুত্তোর" বলিয়া জলগুলি ষ্টোভের উপর ঢালিয়া দিল। ষ্টোভ নিভিয়া গেল।

সে নিশ্চেষ্ট হইয়া চুপচাপ শুইয়া রহিল।

সারাদিন তার এমনি কাটিল। স্থির করিল আজ আর মদ খাইবে না। কিন্তু সন্ধ্যাবেলায় আর পারিল না; বোতল খুলিল। যতই মদ তার পেটে পড়িতে লাগিল, ততই তার অন্তরে দুঃখের সাগর উদ্বেলিত হইতে লাগিল। জগতের উপর, ভগবানের উপর, অদৃষ্টের উপর তার যত অভিযোগ, সব ভিড় করিয়া তার মনের ভিতর ঠেলাঠেলি করিতে লাগিল।

সে তার ঘরের অপরিচ্ছন্নতার দিকে চাহিয়া দেখিল। ভাবিল, এমন ঘরে মানুষ থাকে? মনে পড়িল লতিকার ঘরের কথা—কি পরিষ্কার, ছিমছাম ছবিটির মত সব সেখানে। অমন একখানি ঘর, অমনি একটা স্নিগ্ধ আশ্রয় তো তার হইতে পারিত! তার ভিতর অক্লান্ত সেবা ও নিষ্ঠা লইয়া লতিকা দিনরাত ঘুরিত ফিরিত, শুধু তার সুখের আয়োজনের সন্ধানে! বিনিময়ে সে দিতে পারিত তার বুক-ছাপান ভালবাসা!

এত আয়োজন ছিল তার, কিন্তু অন্ধ অদৃষ্ট তাতে বাদ সাধিল, মাঝখানে হরিচরণকে দাঁড় করাইয়া!—আর সে নিজে মূর্খের মত অদৃষ্টের সাম্রাজ্য মানিয়া লইয়া লতিকাকে যত্ন করিয়া তুলিয়া দিল হরিচরণের হাতে! জ্বালায় তার বুকটা পুড়িয়া গেল। ঢকঢক করিয়া সে তার গেলাস শূন্য করিয়া ফেলিল। আবার পাত্র ভরিল।

হরিচরণ সেদিন রাত্রে যখন আসিয়া পৌঁছিল, তখন অসীম মত্ত হইয়া ঢুলিতেছে, তার চোখ লাল হইয়া উঠিয়াছে।

হরিচরণ তার এ অবস্থা লক্ষ্য করিল না, সে তার আপনার দুঃখে বিহ্বল হইয়া ছিল। তার চুলগুলি উস্কো-খুস্কো, চক্ষু দুটি উন্মত্তের মত, মূর্ত্তি ভয়ানক।

হরিচরণ ধপ্ করিয়া ঘরে বসিয়া পড়িল, 'অসীমদা' শুনেছ তোমার "লতিকার কাণ্ড?"

অসীম ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি? কি ক'রেছে সে?" তার নেশা ছুটিয়া গেল, কিন্তু তার কথাগুলি অনেকটা জড়াইয়া রহিল।

হরিচরণ বলিল, "সে—সে মাগী বেশ্যা!"

"চোপরাও শূয়ার!" বলিয়া অসীম বিকৃত কণ্ঠে গর্জ্জন করিয়া উঠিল। "চোপরাও—যত বড় মুখ নয় তত্ত বড় কথা? বেশ্যা?—হারামজাদা!"

বলিয়া সে হরিচরণের দিকে অগ্রসর হইতে গেল। কিন্তু পা টলিয়া উঠিল, সে আবার ধপ করিয়া বসিয়া পড়িল।

চমকিত হইয়া হরিচরণ তার মুখের দিকে চাহিল। এতক্ষণে সে লক্ষ্য করিল যে অসীম প্রকৃতিস্থ নয়। তার ভারী রাগ হইল অসীমের উপর, ভারী দুঃখ হইল। নিদারুণ মর্ম্মপীড়ায় পুড়িয়া সে আসিয়াছে তার একমাত্র বন্ধুর কাছে ; আর সে বন্ধু কি না ঠিক এই সময় মদ খাইয়া বেহুঁশ, হইয়া বসিয়া আছে! সে বিরক্ত হইয়া উঠিল।

অসীম বলিল, "খবরদার, বোস বলছি, নইলে মেরে ফেলবো। কি বল্লে, বেশ্যা! এত বড় আস্পর্দ্ধা!"

তীব্রকণ্ঠে হরিচরণ বলিল, "হঁা বেশ্যা! দুশোবার বলবো বেশ্যা! আর তোমার যদি মাথা ঠিক থাকতো, আর সব কথা শুনতে, তবে তুমিও বলতে বেশ্যা!"

অসীম বলিল, "আচ্ছা বেশ! বল শুনছি। ভয় পেয়ো না, মাথা আমার ঠিক আছে। অসীম রায়ের মাথা বড় কেও-কেটার মাথা নয় যে চট্ ক'রে খারাপ হবে। বল, কি বলতে চাও। ব'লে যাও।"

হরিচরণ খুব ঝাঁঝের সহিত বলিয়া গেল—সেদিন সে নিজের চক্ষে কি দেখিয়াছে, কি শুনিয়াছে।

সমস্ত শুনিয়া অসীম চীৎকার করিয়া উঠিল, "Rightly served—বেশ ক'রেছে, খুব ক'রেছে। তুমি একটি উল্লুক, আর আমি একটি গাধা। নইলে এমন বাঁদরের গলায় মুক্তমালা ঝোলাতে যাই। বেশ হ'য়েছে—যাও এখন গাছে ব'সে উকু উকু করো গে। আর কি? ক'রবে না? দুশোবার ক'রবে! কতদিন সে তোমার পিত্যেশে উপোসী হ'য়ে ব'সে থাকবে? খুব ক'রেছে, বেশ ক'রেছে।"

ক্রমে অসীমের কথাগুলি অসংবদ্ধ হইয়া উঠিল। বিরক্ত হইয়া হরিচরণ উঠিয়া গেল।

অসীম তখন শূন্য ঘরে বসিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল, "খুব জব্দ, আচ্ছা জব্দ ক'রেছে। যেমন কুকুর তেমনি মুগুর। আর আমি —আমি শালা গাধা।" তারপর সে অবসন্ন হইয়া বসিয়া পড়িল। বলিল, "গেছে সে! একদম বেহাত হ'য়ে গেছে।—হায় হায়!"

১৯

হরিচরণের মনের ঘরে যে আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, তাহা ধীরে ধীরে তাকে তিল তিল করিয়া পোড়াইতে লাগিল। একবার এদিকে তাহা ধোঁয়াইয়া উঠে, আবার অপর দিকে দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠে, আবার আর এক দিকে সে দম্ করিয়া ফাটিয়া উঠে। একবার তার মন রাগে ফুলিয়া উঠে, আবার বিষাদে লুটাইয়া পড়ে, আবার অভিমানে গোঁজ হইয়া বসে। এমনি করিয়া বিচিত্রভাবে তার মন এই তীব্র আঘাতের বেদনায় নিরন্তর ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল।

অসীমের কাছে গিয়াছিল সে সান্ত্বনার আশায়। হতাশ হইয়া ফিরিয়া সে আর কোথাও কোনও আশ্রয় খুঁজিয়া পাইল না। তার নিজের ছোট্ট ঘরখানিতে আসিয়া সে হাত পা ছড়াইয়া শুইয়া পড়িল। আহারের জন্য কোনও আয়োজন করিবার ইচ্ছা তার হইল না।

তার মনে পড়িল—একদিন নয়, একে একে অনেকগুলি দিনের কথা, যখন সে এমনি দারুণ দুঃখে হাত পা এলাইয়া তার পুরাতন কুটীরে শুইয়া পড়িত,—তখন দেবীর মত তার স্নিগ্ধ সেবা লইয়া আসিত লতিকা। সুনিপুণ কল্যাণ হস্তে সে তার সেবা করিত, তার মনের মেঘ মুছিয়া দিত, স্নেহ দিয়া প্রীতি দিয়া তাকে অভিষিক্ত করিত। লতিকার সেই সেবা, সেই স্নেহ, সেই প্রীতির কথা মনে করিতে তার চক্ষু সজল হইয়া উঠিল। হায়, সেই লতিকা এই!

সে দিনও তো লতিকা তাকে কত না সমাদর করিয়াছে, কত স্নেহ দেখাইয়াছে। মুখ ফুটিয়া সে বলে নাই, কিন্তু এ কথা গোপনও রাখিতে পারে নাই যে, সে হরিকে ভালবাসিয়াছে। এই তার ভালবাসা! সব একদম মেকী? এক ফোঁটা সত্য নাই এ সবের তলায়।

কি কপটী এই নারী। অপরূপ তার অভিনয় চাতুরী। তার

ছলাকলায় ভুলাইয়া সে হরিচরণকে পাগল করিয়াছে, শুধু তার বুকে এই শেল মারিবার জন্য।

তার মনে মনে সে একটা নিদারুণ লজ্জা ও অপমান বোধ করিতে লাগিল। ঠকিয়া গেলে ঠকার ব্যথার চেয়ে তার লজ্জাটা আরও বেশী লাগে। এমনি করিয়া হরিচরণ একটা তুচ্ছ চঞ্চলা নারীর মোহে ভুলিয়া গিয়াছিল, মায়াবিনীকে চিনিতে না পারিয়া তাকে দেবী বলিয়া তার পায় পূজা ঢালিতে গিয়াছিল। এটা তার পৌরুষের নিদারুণ অপমান, তার নির্ব্বুদ্ধিতার উপর নির্ম্মম পরিহাস—এই কথাটা তার মনকে পীড়া দিতে লাগিল।

এই অপমান বোধে তার চিত্ত দারুণ অস্বস্তিতে ভরিয়া গেল। আর মনের তলা হইতে তার বঞ্চিত প্রেমের গভীর বেদনা থাকিয়া থাকিয়া গর্জ্জন করিয়া উঠিতে লাগিল।

সে অস্থির হইয়া উঠিয়া বসিল। খানিকক্ষণ প্রবল বেগে পায়চারী করিল। তারপর সে কাগজ কলম লইয়া লতিকাকে চিঠি লিখিতে বসিল।

সে লিখিল।

"তুমি যে কি, তাহা আজ জানিয়াছি। তাতে আমার ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই; কেন না, তুমি আমার কেউ নও।"

এই নিদারুণ মিথ্যা কথাটা লিখিয়া সে একটু থমকাইয়া গেল। তার পর সে মনে মনে জোর করিয়া বলিল, "হাঁ ঠিক। নিশ্চয়। সে আমার কেউ নয়। একটা বেশ্যা সে—সে আমার কে? আবার খুব জোর করিয়া কলম ধরিয়া লিখিল—

"কিন্তু এমন করিয়া আমাকে অপমান করিবার কি দরকার ছিল তোমার? তোমাকে ভালো জানিয়া তোমার নিমন্ত্রণে তোমার বাড়ীতে গিয়াছিলাম। তুমি জানিয়া শুনিয়া আমাকে এতদিন বেশ্যার অন্ন খাওয়াইলে কি সাহসে? আমি গরীব বলিয়া তুমি আমাকে এত বড় অপমান করিলে?"

এই কথার ভিতর সে যে বিষ ঢালিয়া দিল, তাহাতে সে পরিতৃপ্ত হইল। তার পর আবার লিখিল—

"কিন্তু এই অপমান করিয়াই তুমি তৃপ্ত হও নাই—আবার তোমার

পাপ প্রণয়ের সহচরের কাছে আমাকে তোমার প্রণয়ী বলিয়া পরিচয় দিয়াছো—তার কাছে আমাকে দাঁড় করাইয়া লজ্জা দিয়াছ। এত বড় স্পর্দ্ধা তোমার!

কেন? আমার কি মরিবার ঠাঁই নাই যে তোমাকে ভালবাসিতে যাইব? যাকে পদধূলির যোগ্য মনে করি না তাকে হৃদয়ে ঠাঁই দিব? তুমি তো জান, "এ হৃদয় যাকে সঁপিয়াছিলাম, সে দেবীর পদনখ স্পর্শ করিবার যোগ্য তুমি নও।"

"যাক, যা হইবার হইয়া গিয়াছে। আমার অদৃষ্টে তোমার মত কৃমিকীটের কাছে অপমানিত হওয়া লেখা ছিল, তাহা ঘটিয়াছে। এখন আর তোমার ছায়া মাড়াইবার ইচ্ছা আমার নাই। তোমার ঘরে পা' দিতে ইচ্ছা করি না। যে দেবীর মূর্ত্তি তোমার ঘরে আছে, তাকে তোমার পাপ সংসর্গে রাখিব না। অবিলম্বে মূর্ত্তিটা পাঠাইয়া দিবে।"

পত্রখানা ফিরিয়া পড়িয়া তার মনে একটা উৎকট আনন্দ হইল। মনে হইল, এ চিঠি পড়িয়া লতিকার মনে একটা শক্ত রকমের ঘা লাগিবে। তার বঞ্চিত প্রণয়ের কতকটা প্রতিশোধ হইবে। ক্রুদ্ধ তৃপ্তির সহিত সে চিঠিখানি খামে পুরিয়া অবিলম্বে ডাকে ফেলিয়া আসিল।

কিছুক্ষণ মনটা বেশ শান্ত রহিল। কিন্তু তার ক্রোধ ও জিঘাংসার পূর্ণ আবেগটা কাটিয়া গেলে তার সমস্ত চিত্ত আবার একটা তীব্র জ্বালায় চিড়্‌বিড়্ করিয়া উঠিল। মনে হইল—মিথ্যা, মিথ্যা—সব কথা। লতিকা তার কেউ নয়—এর চেয়ে মিথ্যা কিছুই নাই। এখনো যে তার সমস্ত অন্তর অপরাধিনী লতিকার জন্য কামনার ব্যথায় চুরচুর হইয়া রহিয়াছে। তাকে তার মন হইতে দূর করিবে সে কেমন করিয়া?

একটা ব্যথায় অন্তরের সবগুলি ব্যথার নাড়ী টন্‌টন্ করিয়া উঠিল। আর একদিন সে যে এমনি ব্যথায় কাতর হইয়া পড়িয়াছিল বিশে'কে হারাইয়া—সেই ব্যথা তার আজ আবার নূতন করিয়া জাগিয়া উঠিল। বিশে'র ব্যথা-কাতর মলিন মুখখানি তার চিত্তে ভাসিয়া উঠিল, সেই পুরাতন ক্ষত আবার তাজা হইয়া উঠিল।

মনে হইল, আজ তার যে মর্ম্ম বেদনা, সে তার অপরাধের তিরস্কার। বিশে'র স্মৃতির প্রতি অবিশ্বাসী হইয়াছিল সে, তার সর্ব্বত্যাগী ভালবাসার

অপমান করিতে গিয়াছিল, তাই তার এই শাস্তি। এ চিন্তায় তার চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল, কিন্তু অন্তর শান্ত হইল। প্রশান্ত চিত্তে তার স্বর্গগত পত্নীর চিন্তায় তন্ময় হইয়া সে ক্রমে ঘুমাইয়া পড়িল।

পরের দিন সে সারাদিন অশান্ত মনে ছট্‌ফট্ করিয়া কাটাইল। দুই চারটা ছবির বরাত ছিল, সেই উপলক্ষে সে তিন চার জায়গায় গিয়া অনেকক্ষণ গল্প-গুজব করিয়া বেড়াইল। এক বন্ধুর বাড়ীতে একবেলা খাইল। তারপর ঘুরিতে ঘুরিতে একজিবিশনে গেল।

লতিকার সেই ছবিখানার দিকে সে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। একটা কি মোহের আকর্ষণ যেন তার চোখ দুটিকে ওই ছবির সঙ্গে বাঁধিয়া দিল। সে চক্ষু ফিরাইতে পারিল না।

অনেক দিন সে এই ছবির দিকে অতৃপ্ত নয়নে চাহিয়া দেখিয়াছে—আর্টিষ্টের চোখে সে ইহা দেখিয়াছে—কিন্তু দেখিয়াছে শুধু ছবি। আজ সে ইহার ভিতর দেখিল জ্যান্ত মানুষ!

তাহারই তুলিকার নিপুণ স্পর্শে লতিকার ছবিখানি জীবন্ত ও অপরূপ মাধুরীতে ভরিয়া উঠিয়াছে—আজ তার মনে হইল যেন ছবির ভিতর হইতে লতিকা নিজে তার দিকে চাহিয়া আছে। কি করুণ সুন্দর সে দৃষ্টি—কত স্নেহ, কত মধুরতা-ভরা! কত অনুযোগ-ভরা, স্নেহ-তিরস্কার-করা সে-দৃষ্টি!

চাহিয়া চাহিয়া হরিচরণের অন্তর ব্যথিত হইয়া উঠিল। লতিকাকে সে যে কঠোর পত্র লিখিয়াছে, নিদারুণ আঘাত করিয়াছে তার কোমল অন্তরে, তার স্মৃতি এখন তার অন্তরে কষাঘাত করিতে লাগিল। হোক লতিকা অসতী, তবু সে এই লতিকা—এই কোমলহৃদয়া, সেবাপরায়ণা, প্রীতিভরা নারী—তাকে মিথ্যাই সে কঠোর তিরস্কার করিয়াছে। কোনও প্রয়োজন ছিল না এত কঠিন আঘাত করিবার। মনে হইল—লতিকার করুণ চক্ষু দুটী যেন তার দিকে চাহিয়া এই অনুযোগ করিতেছে—তাই সে দৃষ্টি সে সহিতে পারিল না—তার নীরব তিরস্কার তার অন্তরটা মুচড়াইয়া দিল।

যতই সে কথাটা বিচার করিল, ততই তার মনটা ভার হইয়া উঠিল। যতই সে অনুভব করিল যে, সে অন্যায় করিয়াছে, ততই লতিকার অন্যায়টা তার কাছে লঘু বলিয়া মনে হইতে লাগিল। অপরাধের চেয়ে শাস্তিটা

যখন বেশী কঠোর হইয়া পড়ে, তখন অপরাধটা তার পাশে খাটো হইয়া যায়—শাস্তিদাতা যখন তাহা অনুভব করে, তখন তার বিচারে আর কঠোরতা থাকে না।

যখন সে ফিরিল, তখন লতিকার প্রতি তার ক্রোধের জ্বালা একেবারে নিভিয়া গিয়াছে, তার নিজের নির্ম্মম কঠোরতার অনুভূতি তার চিত্ত অনুতপ্ত করিয়া তুলিয়াছে।

অত্যন্ত সঙ্কুচিতভাবে সে আপনার ঘরে প্রবেশ করিল—নিতান্ত অপরাধীর মত। সে আশঙ্কা করিতেছিল যে তার কঠিন পত্রের উত্তরে হয়তো লতিকা পত্র লিখিয়াছে--হয়তো সে নিজেই আসিয়াছে। যে তীব্র হলাহল সে উদ্গীরণ করিয়া দিয়াছে, আজ তার প্রতিক্রিয়ার সম্মুখীন হইতে তার অন্তর সঙ্কুচিত হইল।

সন্তর্পণে ঘরে ঢুকিয়া সে জানিল, কোনও পত্র আসে নাই, কেহ তার সন্ধানে আসে নাই। সে একটু স্বস্তি অনুভব করিল।

সামান্য রকম রান্নার আয়োজন করিয়া সে একটু বিশ্রাম করিতে বসিল। ঠিক সেই সময় তার দুয়ারের সম্মুখে দাঁড়াইল—লতিকা!

ধড়ফড় করিয়া হরিচরণ উঠিয়া দাঁড়াইল। একবার শুধু সে তাকে দেখিল, তারপর নতনয়নে অপরাধীর মত দাঁড়াইয়া রহিল।

কাল যে দুর্দ্ধর্ষ স্পর্দ্ধা লইয়া লতিকার অপরাধের তিরস্কার করিতে গিয়াছিল; আজ তার নিজের অপরাধ বোধে নিতান্ত সঙ্কুচিত হইয়া সে দাঁড়াইয়া রহিল,—লতিকার মুখের দিকে চাহিতে পারিল না, কোনও সম্ভাষণ করিতে সাহস করিল না।

লতিকাও কোনও সম্ভাষণ করিল না। এক মুহূর্ত্ত সে অশেষ বিষাদভরা ক্লিষ্ট দৃষ্টিতে হরিচরণের দিকে চাহিল। লতিকার সহসা শীর্ণ বিষাদক্লিষ্ট মুখে চঞ্চলতার আভাস দেখা দিল, ওষ্ঠাধর একটু কাঁপিয়া উঠিল, চোখের কোণ একটু চক্‌চক্ করিয়া উঠিল। কিন্তু কথা কহিতে সে পারিল না।

মুখ ফিরাইয়া লতিকা তার পশ্চাতে কাকে কি ইঙ্গিত করিল। দুইটি মুটে সযত্নে বিশে'র মূর্ত্তি বহন করিয়া ঘরে প্রবেশ করিল। লতিকা তাড়াতাড়ি ঘরের একটা দিক পরিষ্কার করিয়া একটু স্থান করিয়া দিল। মুটেরা মূর্ত্তিটা সেখানে রাখিয়া বাহির হইয়া গেল।

এক মুহূর্ত্ত লতিকা অপেক্ষা করিল। মূর্ত্তিটার পরিধান বস্ত্র একটু নড়িয়া গিয়াছিল, সে তাহা ঠিক করিয়া দিল, আঁচল দিয়া একটু ধূলা মুছিয়া দিল। তারপর এক মুহূর্ত্ত সে সেই মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া নির্ব্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল! শেষে সস্নেহে সেই মূর্ত্তির চিবুক হস্তে স্পর্শ করিয়া সে হাত চুম্বন করিল।

দুয়ারের কাছে আসিয়া সে একবার হরিচরণের দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল, "যাই এখন।"

হরিচরণ তখন একবার সসঙ্কোচে মুখ তুলিয়া তার দিকে চাহিল। তার বুকের ভিতর দিয়া যেন একটা শূল বিঁধিয়া গেল। লতিকার মূর্ত্তি দেখিয়া সে স্তব্ধ হইল। হঠাৎ যেন একদিনে সে অনেকটা রোগা হইয়া গিয়াছে, চোখের কোণে কালি পড়িয়া গিয়াছে, গাল চুপসাইয়া গিয়াছে! এ করুণ মূর্ত্তি হরিচরণের মর্ম্মে বেদনার সহিত বসিয়া গেল।

লতিকা অপেক্ষা করিল না, মুখ ফিরাইয়া তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল।

হরিচরণ মাথায় হাত দিয়া ভাবিতে লাগিল।

হরিচরণের ঘর হইতে ফিরিয়া লতিকা কোনও মতে রাস্তাটুকু চলিয়া ঘরের ভিতর ধপ্ করিয়া আছাড় খাইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল! এতক্ষণ প্রাণপণ করিয়া যে ধৈর্য্য সে রচনা ও রক্ষা করিয়াছিল, তাহা এখন অশ্রুর বন্যায় ভাসিয়া গেল।

অনেকক্ষণ পড়িয়া পড়িয়া কাঁদিয়া সে চক্ষু মুছিয়া উঠিয়া বসিল। তারপর দুয়ার বন্ধ করিয়া শুইয়া পড়িল।

পরের দিন প্রত্যুষে একজন লোক একখানা চিঠি লইয়া আসিল। লতিকা চিঠি লইয়া পড়িল। অসীম লিখিয়াছে—,

"আমি বড় অসুস্থ। দয়া ক'রে আমাকে একবার দেখে যেও।"

একটা ক্লান্ত দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া লতিকা সে লোককে বলিল, "আচ্ছা তুমি যাও, আমি যাচ্ছি।"

তার হাসপাতালে যাইতে তখনও দুই ঘণ্টা বাকী ছিল। সে কাপড় চোপড় পরিয়া একখানা গাড়ী ডাকিয়া অসীমের মেসে গেল।

ঘরে ঢুকিয়াই লতিকা ঘরের অপরিচ্ছন্নতা দেখিয়া এক মুহূর্ত্ত থমকিয়া দাঁড়াইল। সে ঘরের মেঝেয়, দেয়ালে, কুলঙ্গিতে, আলনায়, বই, বাসন,

কাপড়, জামা, চায়ের সরঞ্জাম, খাবারের ঠোঙা প্রভৃতি বিচিত্র ভাবে এলোমেলো করিয়া ছড়ান রহিয়াছে। চারিদিকেই রাশি রাশি ধূলিসমাদৃত বইয়ের স্তূপ। তার মধ্যে না আছে শ্রী, না আছে শৃঙ্খলা। এক পাশে একটা খাটিয়া, তার উপর গা মুড়ি দিয়া পড়িয়া অসীম।

প্রথমে সে সন্তর্পণে অসীমের কাছে অগ্রসর হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার কি অসুখ, অসীম বাবু?"

অসীম বলিল, "বড় ব্যথা সর্ব্বাঙ্গে, জ্বর—বলিতে বলিতে পাশ ফিরিয়া সে লতিকার মুখের দিকে চাহিয়া থামিয়া গেল। চট্ করিয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল, "এ কি? তোমার কি অসুখ ক'রেছে?"

ম্লান হাসি হাসিয়া লতিকা বলিল, "না, আমাদের কি অসুখ করে? আমরা যে যমের অরুচি।"

"অসুখ নয়, তবে এ হাল হ'লো কেমন ক'রে?"

"কেন, চেহারা কি বড় বিশ্রী দেখাচ্ছে? তা' সুশ্রীই বা আমি কবে?"

অসীম জোর করিয়া তাহার দুই বাহু চাপিয়া ধরিয়া আবেগের সহিত বলিল, "সুশ্রী বিশ্রীর কথা বলছি না—আমাকে ভাঁড়িও না। কি হ'য়েছে তোমার বল। কে তোমার এ দশা ক'রেছে?"

বিষাদের সহিত লতিকা বলিল, "সে কথা শুনে আপনার কি লাভ বলুন?"

হাত ছাড়িয়া দিয়া অসীম বলিল, "লাভের কারবার কোনও দিন করি নি লতিকা, লাভটা কোনও দিন আমার কোনও হিসাবের মধ্যে আসে না! কাজেই আমার লাভ নেই ব'লে ব্যস্ত হ'য়ো না। তোমার কি হ'য়েছে বল!"

"কিছুই হয় নি,—রাত্তিরে ঘুম হয় নি, তাই বোধ হয় একটু রোগা দেখাচ্ছে।"

"রাত্তিরে ঘুম হয় নি ঠিক, কিন্তু কার জন্যে? হরিচরণের জন্যে, না যাকে সে তোমার ঘরে দেখেছিল তার জন্যে?"

লতিকা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "তবে তো সবই জানেন। আপনার বন্ধু তো আপনাকে সবই ব'লেছেন। আবার জিগ্‌গেস ক'রছেন কেন?"

অসীম বলিল, "চুলোয় যাক আমার বন্ধু। আমি জিগ্‌গেস করছি তোমার কথা। তুমি কি বল সেইটাই আমার জানবার দরকার।"

খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া লতিকা বলিল, "এখন থাক। দয়া ক'রে ও-কথা এখন তুলবেন না।" তার বুকের ভিতর যে কান্নাটা ঠেলা মারিতেছিল, তাহা সে কষ্টে দমন করিল, কিন্তু চক্ষু তার ঝাপসা হইয়া গেল। চক্ষু মুছিয়া সে বলিল. "যাক গে, আপনার কি অসুখ বলুন তো।"

অসীম চিৎ হইয়া শুইয়া পড়িল। কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া শেষে বলিল, "অসুখ জ্বর, গায়ে ব্যথা। কিন্তু সেটা অতি তুচ্ছ—তার চেয়ে বড় অসুখ আছে, সে কথা তো বলবার উপায় নেই।"

লতিকা অনুমান করিল, অসীমের কোনও কুৎসিত ব্যাধি আছে। ঘরের ভিতর মদের গন্ধ সে আগেই পাইয়াছিল। অপরিসীম করুণায় তার চক্ষু ভরিয়া উঠিল।

সে বলিল. "আপনি জীবনটাকে এমনি ক'রে ছারখার ক'রছেন কেন বলুন তো ? আপনার জীবনটা তো তুচ্ছ নয়, আমার মত। এর দাম আছে।"

হাসিয়া অসীম বলিল, "আমার জীবনের দাম? এটা তুমি ছাড়া জগতে কেউ এ পর্য্যন্ত আবিষ্কার করে নি। আমার কাছে এর দাম কাণা কড়িও নয়।"

লতিকা হাসিয়া বলিল, "বড়লোকেরা বোধ হয় এমনি অন্ধই হয় নিজের বিষয়ে। কিন্তু আপনার কাছে কোনও দাম থাক বা না থাক অন্যের কাছে আপনার প্রাণের দাম আছে। চলুন আপনাকে আমি হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছি।"

হাসপাতালে নিয়ে যাবে? হাসপাতালে এ রোগের চিকিৎসা হয় না।"

"বাজে কথা। আজকাল কত রকমের ইঞ্জেকশন বেরিয়েছে, কত রোগী সেরে যাচ্ছে রোজ। চলুন।"

অসীম বলিল, "তুমি যদি যেতে বল যাব। চল।"

অসীম উঠিল। লতিকাও উঠিয়া দাঁড়াইল।

অসীমের জামা, জুতা, কাপড় অনেক কষ্ট করিয়া নানা আশ্চর্য্য স্থান হইতে লতিকা খুঁজিয়া বাহির করিল।

সে বলিল, "মা গো, কি ক'রে আপনি এমনি এলো-মেলো হ'য়ে থাকেন। গা খিৎ খিৎ করে না?—আপনি বসুন, আমি ঘরটা একটু গুছিয়ে দি।"

বলিয়া লতিকা সেই জঞ্জালের স্তূপ সংস্কার করিতে নিযুক্ত হইল। দেখিতে দেখিতে ক্রমে ঘরের জিনিষপত্রের ভিতর একটা শৃঙ্খলা গড়িয়া উঠিল। ময়লার কাঁড়ি মুক্ত হইয়া গেল, ঘরখানা যেন ইন্দ্রজাল-বলে রূপান্তরিত হইয়া গেল। অলক্ষ্মীর আস্তাবলে লক্ষ্মীর আসন বসিল।

মুগ্ধ চিত্তে অসীম লতিকার কৃতিত্ব চাহিয়া দেখিল। পরিতৃপ্ত নয়নে সে তার ঘরের দিকে চাহিল। তারপর মুগ্ধ নয়নে লতিকার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তার সে দৃষ্টির ভিতর কোনও আবরণ ছিল না, খোলা দরজার মত দৃষ্টি তার অন্তর একেবারে লতিকার চোখের সামনে মুক্ত করিয়া দিয়াছিল। লতিকা একটু বিব্রতভাবে চক্ষু নামাইয়া বলিল, "উঠুন, চলুন এখন।"

অসীম বিছানায় শুইয়া পড়িয়া বলিল, "না, এখন আর যাব না। এখন এ ঘরখানা ছাড়তে ইচ্ছা হ'চ্ছে না।"

লতিকা বলিল, না—দেখুন, ব্যামো নিয়ে খেলাখেলি ক'রবেন না। অল্পেতে যেটা সারে, দেরী হ'লে সেটা ভয়ানক হ'য়ে বসে।"

হাসিয়া অসীম বলিল, "যা ভাবছো তা নয় লতিকা, তেমন কোনও ব্যামো আমার নেই। একটু জ্বর হ'য়েছে ব'লে ব্যস্ত হবার দরকার নেই।"

"ওমা সে কি, এই না বললেন আপনি যে আপনার কি একটা ব্যামো আছে?"

"সে ব্যারামটা ডাক্তারের সাধ্য নয়।—যাক, সে কথা পরে হবে। এখন তোমার কথাটা একটু শুনি—যে জন্য তোমাকে আসতে ব'লেছি। শুধু একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—তার উত্তর দাও। হরিচরণ কি তোমায় একেবারে ছেড়ে গেছে?"

লতিকার মুখ হঠাৎ একেবারে কালিতে ছাইয়া গেল। সে কিছুক্ষণ নির্ব্বাক্ থাকিয়া বলিল, "হাঁ।"

অসীম এ কথায় অন্যায় রূপে পুলকিত হইয়া উঠিল। সে বলিল, "আর সেই বাবুটি? যাকে হরি দেখেছিল, তাঁর সম্বন্ধে তোমার ভাবটা কি?

লতিকার চোখ জ্বলিয়া উঠিল। সে কোন উত্তর দিল না—একটু পরে সে বলিল, "আমার হাসপাতালে যাবার সময় হ'য়ে গেছে—আমি যাই।" বলিয়া ছুটিয়া পলাইল।

সন্ধ্যা বেলায় লতিকা তার ঘরে চুপ করিয়া বসিয়া ছিল। তার চোখ দুটো ছিল হরিচরণের হাতের আঁকা একখানা ছবির উপর। তার গণ্ডের উপর অশ্রুর ধারা বহিতেছিল।

এমন সময় অসীম আসিয়া উপস্থিত হইল।

অসীমের পা টলমল করিতেছে, চোখ দুটি ঢুলু ঢুলু।

লতিকা তাড়াতাড়ি চক্ষু মুছিয়া তার দিকে চাহিয়া বলিল, "আসুন।" তারপর অসীমের অবস্থা বুঝিয়া ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিল, "আ, মরণ, অসুখ শরীরেও ঐগুলো খেয়ে ম'রেছেন?"

সে হাতে ধরিয়া অসীমকে একটা চেয়ারে বসাইল। তারপর একটা গামলা ও কয়েক ঘটি জল আনিয়া অসীমের মাথা বেশ করিয়া ধোয়াইল, ও একটা ভিজা তোয়ালে তার মাথায় জড়াইয়া দিল। এ শুশ্রূষায় অসীম কোনও বাধা দিল না।

অসীমকে প্রকৃতিস্থ করিয়া লতিকা একটু তফাতে একখানা চেয়ারে শক্ত হইয়া বসিল। সে জিজ্ঞাসা করিল, "কি মনে ক'রে এমনভাবে এসেছেন আমার কাছে শুনি?"

অসীম বলিল, "কি মনে ক'রে এসেছি, সে কথা গুছিয়ে ব'লতে একটু সময় লাগবে। নেশাটা ক'রেছিলাম সেই জন্যেই—কিন্তু তা তো তুমি ছুটিয়ে দিলে। এখন একটু সময় দিতে হবে।"

"গুছিয়ে বলবার কোনও দরকার নেই। বলবারই দরকার নেই—আমি অমনি বুঝেছি। আপনি যা ভেবেছেন, আমি তা' নই। আপনার বন্ধু আপনাকে মিথ্যা কথা ব'লেছেন।"

হাসিয়া অসীম বলিল, "আমি যা ভাবছি, তা তুমি না হ'তে পার; কিন্তু আমি যা ভাবছি ব'লে তুমি মনে ক'রছো, তা আমি ভাবছি না।"

"যাক, হেঁয়ালী রাখুন। স্পষ্ট কথা বলুন—স্পষ্ট জবাব দিয়ে দিচ্ছি। কি চান আপনি? কেন এসেছেন আপনি?"

একটু হাসিয়া অসীম বলিল, "স্পষ্ট শুনতে চাও—বেশ, স্পষ্টই বলছি—আমি এসেছি ভালবাসি ব'লে—আমি চাই ভালবাসা।"

হঠাৎ লতিকা এমন একটা অট্টহাসি হাসিল যে অসীম চমকাইয়া উঠিল। হাসিয়া লতিকা বলিল, "ভালবাসা? কেন? আপনার বন্ধু কি বলেন নি আমি বেশ্যা? বেশ্যা কি ভালবাসে?"

কাতর ভাবে অসীম বলিল, "সেটা যে মিথ্যা কথা লতিকা।"

"কে বল্লে মিথ্যা? বিশ্বাস না করেন এই দেখুন আপনার বন্ধুর চিঠি। হরিচরণবাবু মিথ্যা বলেন না।"

হরিচরণের চিঠিখানা আনিয়া সে অসীমের হাতের উপর ছুঁড়িয়া দিল। অসীম পড়িল; ক্রোধে তার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল।

অসীম বলিল, "এর পরেও তুমি তাকে ভালবাস?"

"বাসি কি না, সে কথা শুনে আপনার লাভ?"

"আবার লাভ! লাভ আছে আমার। তাকে যদি ভালবাস তবে তুমি আমার অস্পৃশ্যা। তাকে তুমি ভালবাস ব'লেই আমি সরে দাঁড়িয়েছিলাম। নইলে আজ যে কথা বললাম সে কথা ব'লতাম আমি অনেক আগে। তোমাকে আজ আমি হঠাৎ ভালবাসিনি লতিকা, ভালবেসেছি যেদিন প্রথম তোমাকে হরিচরণের ঘরে দেখেছিলাম। সেই থেকে পুড়ছি আমি এ আগুনে—শুধু মুখ ফুটে বলি নি তুমি হরিচরণকে ভালবাস ব'লে। কিন্তু হরিচরণ ছাড়া আর কোনও প্রতিদ্বন্দ্বী আমি হ'তে দেব না।"

হাসিয়া লতিকা বলিল, "কেন? এত জোর কিসে আপনার?"

"আমার জোর এই যে আমি তোমায় ভালবাসি। আর আমি বড় অসহায়। আর যে কেউ হোক, তার তোমাকে ছাড়া চলবে, আমার চলবে না।"

লতিকা উত্তর দিল না। অসীম যে বড় অসহায় জীব তাহা সে জানিয়াছিল। সে আপনি আপনার ভার বহিতে সম্পূর্ণ অসমর্থ। তাই তার এই কথাটা লতিকার হৃদয়ে করুণার এক তন্ত্রীতে আঘাত করিল। সে চুপ করিয়া রহিল।

সাহস পাইয়া অসীম বলিল, "দেখ লতিকা, আমার ঘরে তুমি যখন

গিয়েছিলে, কি বিশ্রী এলো-মেলো জঙ্গল হ'য়েছিল ঘরখানা, লক্ষ্মীর হাত পড়ে' এক মুহূর্ত্তে সেটা শ্রীমান হ'য়ে উঠলো। তখন আমার মনে হ'চ্ছিল, যে আমার এই এলো-মেলো জীবনটাকে যদি একবার তোমার হাতে তুলে দিতে পারতাম, তবে হয়তো তুমি এটাকেও তোমার কল্যাণহস্তে সুশ্রী ও মঙ্গলময় ক'রে তুলতে পারতে। জীবনের এতগুলো বছর কেবল গড়িয়ে কাটিয়ে দিলাম, এলো-মেলো জঙ্গলের ভিতর। এখন প্রাণটা হাঁপিয়ে উঠছে! লক্ষ্মীছাড়া হ'য়ে থাকতে আর ভাল লাগে না। লক্ষ্মীকে হাতের গোড়ায় দেখে তাই স্থির থাকতে পারছি নে। আমার উপর একটু দয়া কর লতিকা। আমার এই হতচ্ছাড়া জীবনটাকে গুছিয়ে একটু সভ্যভব্য ক'রে দাও।"

দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িয়া অনেকক্ষণ পর লতিকা বলিল, "না, ও সব পাট আমি ছেড়ে দিয়েছি—দেখেছি, পুরুষেরা শুধু দুঃখ দিতেই জানে, ভালবাসতে জানে না।"

অসীম হতাশ ভাবে মাটির দিকে চাহিয়া শুধু একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিল।

একটু পরে লতিকা বলিল, "ভালবাসা বলতে আপনারা যা বোঝেন আমরা তা বুঝি না। আপনি যাকে ভালবাসা বলছেন, সে জিনিসের উপর আমার লোভ কোনও দিনই ছিল না, আপনার বন্ধু যাই ভাবুন।"

অসীম চমকিত হইয়া বলিল, "আমায় ভুল বুঝো না লতিকা। আমি ভালবাসার নামে আর কিছু চাই না, ভালবাসাই চাই। আমি তোমার কাছে কোনও অন্যায় প্রস্তাব করছি না, আমি চাই তোমাকে বিয়ে ক'রতে।"

একটু বিস্মিত হইয়া লতিকা বলিল, "আমাকে বিয়ে ক'রবেন,—জাত যাবে না?"

"জাত আমার যাবার নয়, কেন না, তোমার যে জাত সেই আমার জাত।"

কিন্তু আপনি তো জানেন আমি—এই—আমার চরিত্র—নিষ্কলঙ্ক নয়।"

"সে হোক বা না হোক তাতে আমার কিছু যায় আসে না। তোমার অতীতকে আমি চাই না লতিকা, চাই তোমার ভবিষ্যৎ।"

লতিকা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "নাঃ, সে হয় না অসীমবাবু।"

"কেন হয় না? কিসের বাধা?"

মুখ নীচু করিয়া লতিকা বলিল, "ভালবাসা অত শীগগির যায়ও না, গজায়ও না। আপনার বন্ধুকে জন্মের মত হারিয়েছি, কিন্তু তাকে ভালবাসি নে এ কথা ব'লতে পারি না।"

লতিকার চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল।

একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িয়া অসীম উঠিল। অনেকক্ষণ নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া সে বলিল, "বেশ, তবে আর আমার কথা নেই। কিন্তু একটা কথা জিগগেস্ করি। হরিচরণ যদি তার ভুল বুঝতে পারে, যদি সে তোমার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করে, তবে তাকে মার্জ্জনা ক'রতে পারবে?"

দৃঢ়কণ্ঠে লতিকা বলিল, "কখনও না, এ জন্মে না।"

অসীম অবাক্ হইয়া লতিকার মুখের দিকে চাহিল। কিছুক্ষণ বাদে সে বলিল, "বেশ, তবে তাই হোক। চল্লাম। আর দেখা হবে না।"

অসীম ব্যথিত অন্তরে দুয়ারের দিকে চলিল।

তার শেষ কথাটায় লতিকার মনে আঘাত করিল। সে কাতর দৃষ্টিতে অসীমের বিষাদ-ভারাক্রান্ত মুখের দিকে চাহিল।

দুয়ারের কাছে গিয়া অসীম ফিরিয়া তার মাথায় বাঁধা তোয়ালেটা খুলিয়া দিয়া গেল।

লতিকা বলিল, "রাগ করলেন আমার উপর?"

অসীম অশেষ কাতরতার সহিত বলিল, "না—তোমার উপর রাগ ক'রবো কেন লতিকা? এ ছাড়া আর কি ক'রবে তুমি—কেন ক'রবে? এই যে আমার ভাগ্য। জীবনটাকে শুধু ছারখার করাই যে আমার অদৃষ্ট। সে অদৃষ্ট থেকে রক্ষা পাব আমি—এ কি হ'তে পারে?"

লতিকা অসীমের হাত ধরিয়া বলিল, "অমন কথা বলবেন না। আমার জন্য আপনার জীবনটাকে নষ্ট ক'রবেন না। আমাকে যদি ভালবাসেন, তবে আপনার কথা দিতে হবে, আপনি এর পর সাবধান হবেন—আর ঐ মদটা আর খাবেন না।"

"কেন লতিকা? কেন সাবধান হব? লক্ষ্মীছাড়া, সৃষ্টি-ছাড়া একটা জীবন। যার জন্য কাঁদবার কেউ নেই, যার সমাদর করবার কেউ নেই,

এমন একটা তুচ্ছ জিনিসের পেছনে অতটা যত্ন অপচয় ক'রবো কেন? অদৃষ্ট আমাকে নিয়ে খেলা খেলতে পারে। আমিও তাকে একহাত খেলা দেখিয়ে দেবো।"

লতিকা জোর করিয়া টানিয়া তাকে বসাইল। কাতর কণ্ঠে সে বলিল, "ছি, অমন কথা বলবেন না। পুরুষ মানুষ আপনি।"

"সেই জন্যই তো পুরুষের মত লড়বো অদৃষ্টের সঙ্গে! অদৃষ্টকে ফাঁকি না দিতে পারলে পৌরুষ কিসে আমার?"

লতিকা তাহার হাত ছাড়িয়া দিয়া দু হাতে মাথা চাপিয়া ধরিল। তার বুকের ভিতর কাতর অন্তর আছাড়ি-পিছাড়ি করিতে লাগিল।

অসীমকে সে ভালবাসে না। তাকে বিবাহ করিবার মত করিয়া ভালবাসা সে কখনও বাসে নাই, কিন্তু এতদিনের সাহচর্য্যে তার প্রতি লতিকার চিত্তে অপরিসীম মমতা জন্মিয়াছিল। অসাধারণ মেধাবী, এবং পরম সহৃদয় বান্ধব বলিয়া অসীমকে সে বড় প্রীতির চক্ষে দেখিয়াছিল।

সে দেখিতে পাইল, অসীমের স্বচ্ছ মুখ-চোখের ভিতর একটা বুকভাঙ্গা বেদনা। স্পষ্ট বুঝিতে পারিল যে, তার কাছে আজ এই আঘাত খাইয়া অসীমের বুকের ভিতর এমন একটা নিদারুণ হতাশা হাহাকার করিয়া উঠিয়াছে যে, সারা জীবনটাই তার কাছে মরুভূমির মত অসার হইয়া গিয়াছে।

গভীর করুণায় তার চিত্ত ভরিয়া উঠিল, উদার সহৃদয়তায় তার চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল।

কিন্তু হায়! অসীমের প্রেমতৃষ্ণা মিটাইবার সম্বল তো তার নাই—তার সব যে লুটিয়া লইয়া গিয়াছে হরিচরণ—অসীমকে সে দিবে কি?

হরিচরণ তাকে পরিত্যাগ করিয়াছে—জানাইয়াছে যে, সে কোনও দিনই তাকে ভালবাসে না। সে দিকে কোনও বন্ধনই লতিকার নাই। কিন্তু তবু তো সে তাকেই তার সর্ব্বস্ব উজাড় করিয়া দিয়া তার জীবনকে মরুভূমি করিয়া ফেলিয়াছে।

অসীমের ব্যথার অনুভূতির সঙ্গে সঙ্গে তার নিজের হৃদয়ের এ ব্যর্থতার ব্যথা হাহাকার করিয়া উঠিল। সে বুঝিল, এমনি শূন্য, এমনি অগ্নিগর্ভ হইয়া গিয়াছে অসীমের হৃদয়।

করুণায় তার দুই চোখ ভরিয়া উঠিল।

অবশেষে সে বলিল, "দেখুন, এমন ক'রে আমাকে দুঃখ দেবেন না। বলুন—আপনি ভাল হবেন?"

হাসিয়া অসীম বলিল, "আমি তো মন্দ নই লতিকা?"

"তা নন,—আপনি যে কত ভাল, তা কি আর আমি জানি না। তাই তো বলছি—ও ছাই আপনি ছাড়ুন। বিয়ে-থা ক'রে জীবনটাকে গুছিয়ে নিন। আমি ছাড়াও তো মেয়ে আছে। বাঙ্গলা দেশে এমন কোন্ মেয়ে আছে যে আপনাকে পেলে কৃতার্থ না হবে?"

"তার প্রমাণ তুমি।" বলিয়া অসীম কঠোর হাস্য করিল।

"আমি?—আমাকে ভুল বুঝবেন না আপনি। আপনাকে তুচ্ছ করি নি আমি। আপনি যে আমাকে চান, সে আমার কত বড় সৌভাগ্য, তা কি আমি জানি না? কিন্তু আমাকে দেবার অধিকার আমার নেই,—আপনাকে বঞ্চনা করবার শক্তি আমার নেই।" বলিয়া সে মাথা নীচু করিয়া রহিল।

অনেকক্ষণ দুজনেই নীরবে রহিল।

শেষে অসীম বলিল, "তবে এখন আমি যাই।"

এমন অশেষ ব্যথার সহিত অসীম কথাটা বলিল যে, লতিকার হৃদয় তাতে কাঁদিয়া উঠিল। তার মনে হইল—অসীম যাইতেছে আর আসিবে না—এখন সে শুধু নিজের জীবনটাকে উজাড় করিয়া ছারখার করিয়া দিবে!

মনে হইল কত অসহায় অসীম! কত অশক্ত সে আপনার ভার বহিতে! তার ঘরে একদিন তাকে দেখিয়াছে লতিকা—দেখিয়াই তার চিত্ত ভরিয়া উঠিয়াছিল, এই অসহায় প্রাণীটির প্রতি অশেষ করুণায়। সেবাপরায়ণ চিত্ত তার তখনি অসীমকে আপনার স্নেহের পক্ষপুটে আশ্রয় দিয়াছিল।

আজ বন্ধনহারা হইয়া, লতিকার নিকট হইতে দূরে সরিয়া গিয়া অসীম কোথায় কেমন করিয়া আপনার সর্ব্বনাশ করিয়া বসিবে ভাবিয়া লতিকা ব্যাকুল হইল। তার অন্তরের সেবাময়ী স্নেহময়ী নারী এ কল্পনায় আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল।

ব্যথাতুর চিত্তে সে বলিল, "আবার আসবেন তো কাল?"

অসীম উদাস ভাবে ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "না,—আর আসব কেন

বল ?" এত পরিপূর্ণ হতাশার সহিত সে কথা কয়টা বলিল যে, কথাগুলি দীপ্ত অগ্নিশিখার মত লতিকার অন্তর দগ্ধ করিয়া ফেলিল।

অসীম তাকে চিরদিনই ভালবাসিয়াছে। কোনও দিনই মুখ ফুটিয়া বলে নাই অসীম, কিন্তু আজ তার মুখে সে কথা শুনিয়া লতিকার মনে পড়িল তাদের পরিচয়-কালের ভিতর অনেকগুলি ঘটনা অনেকগুলি কথা, যাতে অসীমের আত্মত্যাগী সুদীর্ঘ ভালবাসার স্বরূপ জ্বল্‌জ্বল্‌ করিয়া ফুটিয়া উঠিল তার চক্ষে ;—লতিকা তখন তাহা বুঝিয়াও বোঝে নাই।

এত বড় অন্তরের এতখানি ভালবাসা এমনি করিয়া বিমুখ করিয়া সে নষ্ট করিয়া দিবে এত বড় একটা জীবন ?

কিন্তু—কেমন করিয়া সে স্বীকার করিবে ? তার যে এত প্রেমের বিনিময়ে দিবার কিছুই নাই। কেমন করিয়া বঞ্চনা করিবে অসীমকে ?

ভাবিতে ভাবিতে তার কল্পনার চক্ষে ফুটিয়া উঠিল, গার্হস্থ্য জীবনের স্বামী-পুত্র-কন্যার স্নেহপূত মনোরম চিত্র ! অনেক দিনই তার চিত্ত এই তৃপ্তির জন্য তৃষিত হইয়াছে, আকুল ভাবে কামনা করিয়াছে সে গৃহিণীর স্নেহ পরিবৃত জীবন। সে কামনা তাকে লুব্ধ করিল।

অসীমের প্রতি করুণা তার বিমুখতা দুর্ব্বল করিয়া দিল। সে কোমল স্নিগ্ধ সজল দৃষ্টিতে অসীমের ব্যথা-কাতর মুখের দিকে চাহিয়া কেবলি ভাবিতে লাগিল।

অনেকক্ষণ পর অসীম আবার বলিল, "আমি উঠি তবে ?"

লতিকা বলিল, "দেখুন, কেন আপনি অমন ক'রে আমাকে চাচ্ছেন ? আপনি তো জানেন আমি আপনার যোগ্য নই ?"

"যোগ্যাযোগ্যের বিচার করবার অবস্থা নেই আমার লতিকা। আমি পাগল হ'য়ে গেছি। এ শুকনো মরা জীবন বইতে আর পারছি না—সামনে দেখছি সুধাপাত্র—তাই পাগল হ'য়ে গেছি ! তাই তোমাকে বিরক্ত ক'রেছি—ক্ষমা ক'রো আমায়।" বলিয়া অসীম উঠিল।

"কিন্তু—জানেন তো—আমি তাঁকে ভালবাসতাম—এখনও হয়তো ভালবাসি।"

"জানি—তাই তোমার উপর আমার কোন দাবী-দাওয়া নেই। হরিচরণকে যতক্ষণ তুমি চাও ততক্ষণ আমার কোন কথা নেই।"

"না—চাই না আমি তাঁকে। তা' ছাড়া তিনি লিখেছেন তিনি আমাকে চান না। কোনও দিনই চান নি। গিয়েছিলাম আমি তাঁর কাছে--একটি কথাও তিনি বলেন নি। কেন চাইবো তাঁকে আমি? কিন্তু ভাল তাঁকেই বেসেছি—সে তো জানেন।"

"জানি।"

"তা ছাড়া—নিষ্কলঙ্ক নয় আমার চরিত্র তাও আপনি জানেন। তবু —তবু আমাকে চান আপনি? সমস্ত প্রাণমন আমার আপনাকে দিতে পারবো না—হয় তো কোনও দিনই—তবু চান?"

অসীম প্রশান্তভাবে বলিল, "সমস্ত প্রাণমন দিয়ে তবু তোমাকে চাই। তোমাকে চাই বল্লে ঠিক হবে না, আমার সব ভার শুধু তোমাকে দিতে চাই!"

আর একটু স্থির হইয়া থাকিয়া লতিকা শেষে বলিল, "বেশ—নিন তবে।" বলিয়া সে অসীমের পায় লুটাইয়া তাকে প্রণাম করিল।

অসীম তাকে বুকের কাছে তুলিয়া ধরিয়া তার অশ্রুভারাক্রান্ত অধরে একটি চুম্বন দিল।

২০

লতিকা আসিয়াছিল—সে তাকে একরকম কোনও সভাষণ না করিয়াই চলিয়া গিয়াছে! এই কথাটা হরিচরণের মনের ভিতর কেবলই আঘাত করিতে লাগিল। তার প্রাণ ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল।

লতিকাকে সে কঠোর আঘাত করিয়াছে, সেটা লতিকার বুকে লাগিয়াছে। কিন্তু কি দুঃখে যে সে এমন নির্ম্মম আঘাত করিয়াছে, লতিকা তার কি জানে? লতিকাকে সে যে কতখানি ভালবাসে, কত বড় ভালবাসায় ঘা খাইয়া যে সে এত নিষ্ঠুর হইতে পারিয়াছিল, তার কোনও খবর তো লতিকা জানে না।

একবার তার মনে হইয়াছিল, ছুটিয়া গিয়া লতিকাকে ধরিয়া তার পা ধরিয়া ক্ষমা চাহিবে,—আর একবার তার মুখ হইতে শুনিবে সে তাকে ভালবাসে কি না। একবার, শুধু একবার যদি লতিকা নিজমুখে বলে যে, হরিচরণ যা দেখিয়াছিল সে একটা স্বপ্ন, তবে যে হরিচরণ হাতে স্বর্গ পাইবে। কিন্তু নিদারুণ লজ্জা ও অপরাধীর সঙ্কোচ তার দুই পায় বেড়ী দিয়া ধরিল। সে বাহির হইতে পারিল না।

পরের দিন সকালে সে স্থির করিল যে ইহাতে চলিবে না। ঠিক এমনি করিয়া তার সঙ্গে লতিকার বিচ্ছেদ হইতে পারে না। একটা বোঝাপড়া হওয়া দরকার।

সে লতিকার সন্ধানে বাহির হইল। তার, বাড়ীর দুয়ারের কাছে গিয়া তার পা উঠিল না। কোন্ মুখে গিয়া সে এখন উঠিবে? কি কথা বলিবে সে? কেমন করিয়া লতিকার ঐ অভিযোগ-ভরা দৃষ্টির সামনে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবে?

অনেকক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া শেষে সে দুয়ারের কাছে আসিল। দেখিল লতিকা বাড়ী নাই। একটু বিস্মিত হইল। তার হাঁসপাতাল

যাইবার সময় হইতে তখনও দেরী ছিল। তবে সে এত সকালে গেল কোথায়?

সে বিরক্ত হইল, কিন্তু আপাততঃ যে সে সাক্ষাতের সঙ্কোচ হইতে বাঁচিয়া গেল, তাতে একটু স্বস্তিও বোধ করিল।

তারপর সে কিছুক্ষণ পথে পথে শুধু ভাসিয়া বেড়াইল। একটা দোকানে কিছু খাইয়া শেষে সে একজিবিশনে গেল।

সেদিন ছবিগুলির বিচারের ফল প্রকাশ হইবার কথা।

আশায় উৎকণ্ঠায় অস্থির হইয়া হরিচরণ সেখানে দাঁড়াইয়া রহিল।

অনেকক্ষণ পর বিচারকদের বিচার ফল প্রকাশিত হইল। কেরাণী যখন বিচার-ফল টাঙাইয়া দিল, তখন হরিচরণ কম্পিত বক্ষে চক্ষুময় হইয়া তাহা পড়িতে লাগিল।

সমস্ত পড়িয়া হরিচরণ বসিয়া পড়িল।

পুরস্কার পাইয়াছে যারা চিরদিন পায় তারা, আর তাদের শিষ্য প্রশিষ্যের দল—হরিচরণ পায় নাই। শুধু সেই তালিকার শেষে হরিচরণের নাম আরও বিশ পঁচিশ জনের সঙ্গে প্রশংসার সহিত উল্লেখ করা হইয়াছে।

তার জীবনের শেষ আশ্রয় যেন তার পায়ের তলা হইতে সরিয়া গেল। হরিচরণ এক মুহূর্ত্ত জগৎ অন্ধকার দেখিল।

সে কষ্টে আপনার দেহখানি টানিয়া তার ঘরে লইয়া গেল। দুয়ার বন্ধ করিয়া দিয়া সে শুইয়া পড়িল।

বস্, সব শেষ—সমস্ত আশার সমাধি হইয়া গিয়াছে। এখন আর তার লতিকার সঙ্গে বোঝাপড়া করিবার কোনও প্রয়োজন নাই। লতিকাকে মুখ দেখাইবারও তার মুখ নাই।

সমস্ত বিশ্ব তার চোখে কালিমাময় হইয়া গেল। বাঁচিয়া থাকিবার এক বিন্দু উৎসাহ তার রহিল না।

মরুভূমির মত শূন্য উদাস অন্তরে সে শুধু নিষ্কর্ম্মা হইয়া দুই দিন পড়িয়া রহিল।

তারপর তার হুঁস হইল যে ছবিখানা অসীমের,—সেখানা তাকে ফিরাইয়া দিতে হইবে।

ক্লান্ত চরণে সে আবার একজিবিশনে গেল। তার ছবিখানা ফেরৎ

চাহিল। যে কর্ম্মচারীর সঙ্গে তার কথা হইল সে বলিল, "আপনার নাম হরিচরণ পাল ?"

"হাঁ।"

কর্ম্মচারীটি তার নোটবুক খুলিয়া দেখিল। তারপর বলিল, "হাঁ—আপনিই বটে। দেখুন, আপনার ছবিখানা আপনি কি বেচবেন না ?"

হরিচরণ ক্ষীণকণ্ঠে বলিল, "ছবি আমার নয়,—ওখানা অর্ডারি ছবি।"

"বেচলে কিন্তু ভাল গ্রাহক আছে, পাঁচশ' টাকা পেতে পারেন।"

"ছবি যখন আমার নয়, তখন আমি বেচবো কেমন করে ?"

"তাঁকে কপি ক'রে দিলে হয় না ? খদ্দেরটি সেজন্য অপেক্ষা ক'রতে রাজী আছেন।"

"না, আমি ওর কপি ক'রতে পারবো না। আমার আর ইচ্ছে নেই।"

"যিনি ছবি কিনেছেন তিনিও তো বেচতে পারেন—কে তিনি ?"

হরিচরণ অসীমের নাম বলিল।

কর্ম্মচারী বলিল, "তিনি নিশ্চয় বেচবেন—আপনি একবার জিজ্ঞেস ক'রে আসুন গে। দামের জন্য ঠেকবে না, পাঁচশো টাকার বেশীও হ'তে পারে।"

হরিচরণের এতক্ষণে একটু কৌতূহল হইল। সে জিজ্ঞাসা করিল, খরিদ্দারটি কে ? শুনিতে পাইল যে ইটালীর কন্সালের সঙ্গে একটি বড়লোক আসিয়াছিলেন, ছবিখানা তাঁর চোখে লাগিয়া গিয়াছে।

কর্ম্মচারীটি বলিলেন, "হাঁ, তিনি আপনার সঙ্গে দেখা ক'রতেও চেয়েছেন। আপনি একবার যান না সেখানে,—তাঁর সঙ্গে কথা কয়ে আসুন গে।"

হরিচরণের মন আবার চঞ্চল হইয়া উঠিল, আশা আবার রঙীন হইয়া উঠিল। সত্য সত্যই যদি সে এ ছবিখানা, ধর, হাজার টাকায় বেচিতে পারে, তবে তো তার আশা আছে। লতিকার সঙ্গে একটা শেষ বোঝাপড়া অসম্ভব নাও হইতে পারে। এখন মনে হইল, বোঝাপড়া হইলেই সব মিটিয়া যাইবে ; বোঝা যাইবে যে সমস্ত ব্যাপারটা হয়তো ভুল !

কম্পিত পদে সে ইটালীয়ান কন্সালের বাড়ীতে গিয়া সেই ধনী

ইটালীয়ানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিল। যাহা শুনিল তাহা তার সকল আশার অতীত।

সে ভদ্রলোক হরিচরণের ছবিখানার অনেক প্রশংসা করিলেন। তিনি ছবির মালিককে অনুরোধ করিতে বলিলেন। সে যদি হাজার টাকা মূল্যেও ছবিখানা না বেচিতে চায়, তবে তিনি অগত্যা একখানা কপি লইতেও প্রস্তুত আছেন।

ভদ্রলোকটি ভারত ভ্রমণ করিয়া, এখানে যাহা কিছু দেখিবার আছে, সব দেখিয়া যাইবেন বলিয়া আসিয়াছেন। তিনি ইটালীর একজন প্রসিদ্ধ ধনী ও চিত্রসংগ্রাহক। ভারতে ঘুরিয়া তাঁর যে-সব জিনিষ চোখে লাগিবে—বিশেষতঃ ভারতীয় জীবনের যে-সব প্রকাশ তাঁর ভাল লাগিবে, সে-সবের ছবি তিনি লইয়া যাইবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। তাই তিনি প্রস্তাব করিলেন যে, হরিচরণকে তিনি বেতন ও পাথেয় দিয়া সঙ্গে লইয়া ভ্রমণ করিবেন, হরিচরণকে শুধু তাঁর ফরমায়েস মত ছবি আঁকিতে হইবে। বেতন প্রস্তাব করিলেন—মাসে পাঁচ শত টাকা।

আনন্দে হরিচরণের হৃদয় নাচিয়া উঠিল। সে কোনও মতে সাহেবের সঙ্গে কথাবার্ত্তা শেষ করিয়া ছুটিল লতিকার কাছে। এখন আর তার কোনও দ্বিধা, কোনও সঙ্কোচ রহিল না। লতিকাকে সে যে এতবড় অপমান করিয়াছে, লতিকার কাছে সে যে এতবড় দাগা পাইয়াছে, উৎসাহের আতিশয্যে সে সব ভুলিয়া গেল। তার শুধু মনে হইল, এতদিনে ভগবান মুখ তুলিয়া চাহিয়াছেন। এতদিনে তার দুঃখের অবসান! লতিকাকে এখন সে পাইবে।

লতিকার বাড়ীর কাছাকাছি আসিয়া তার দেখা হইল অসীমের সঙ্গে—সেও লতিকার বাড়ী যাইতেছিল। তার মুখও আনন্দে উৎফুল্ল!

অসীম তাহার পিঠ চাপড়াইয়া বলিল, "এই যে হরি! তোমাকে আমি আজ সারাদিন গরুখোঁজা ক'রে বেড়াচ্ছি। আর আশ্চর্য্যের কথা এই যে, তাতেই তোমাকে পাওয়া গেল।"

হরিচরণ বলিল, "আমিও তোমাকেই চাচ্ছিলাম! শোন, তোমার সে ছবিখানা বেচবে? হাজার টাকা দাম হ'য়েছে।"

"আমার ছবি—কোন্ ছবি?"

"ওই যে—যেখানা আমি একজিবিশনে দিয়েছিলাম।"

হাসিয়া অসীম বলিল, "সে ছবি আমার হ'ল কবে ? আমি তার দাম দিয়েছি, না দেবার শক্তি আছে আমার ? যাও—বেচগে তুমি ও ছবি। ওতে আর আমার দরকার নেই ! এখন আমার কথা শোন—যে খবরটা শোনাবার জন্য তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম। এতদিনে এ লক্ষ্মীছাড়ার লক্ষ্মী মিলেছে।"

"তাই না কি ? বিয়ে ?"

"হাঁ।"

"কবে ?"

"বিয়ে হবে মাসখানেক বাদে। একটা বেয়াড়া আইন আছে যে নোটিশ না দিলে বিয়ে হয় না, তাই এই অযথা বিলম্ব। কিন্তু সে হোক, আইনকে তার পাওনা-গণ্ডা কড়াক্রান্তি মিটিয়ে দিতে আমার এখন আপত্তি নেই। আমি লক্ষ্মীলাভ ক'রেছি—ভগবান মুখ তুলে চেয়েছেন।"

"তাই না কি ? ভগবান আছেন তা হ'লে ?"

"এখন আর সন্দেহ নেই ভাই—ভগবান আছেন। তিনি চিরদিনই আছেন। চিরদিনই আমার সঙ্গে সঙ্গে থেকে আমার মত হতচ্ছাড়া অবিশ্বাসীকে আপদ-বিপদ থেকে রক্ষা ক'রে এসেছেন—আজকের এই মঙ্গলময় পরিণতির জন্য। আজ আমার চোখের পরদা প'ড়ে গেছে। লতিকা আমার মোহের ঘোর কাটিয়ে দিয়েছে। সত্যি ভাই, সে যখন ভগবানের কথা বলে, তখন অতিবড় অবিশ্বাসীরও বিশ্বাস না হ'য়ে উপায় নেই।"

হরিচরণ হাসিয়া বলিল, "ভগবানের পক্ষ থেকে তোমাকে আমি তাঁর ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে, এতদিনে তাঁকে পৃথিবীতে একটা জায়গা দিলে তুমি। বেচারা তোমার জ্বালায় এতদিন অস্থির হ'য়ে ঘুরছিল।"

অসীম হাসিল, বলিল, "কেন ভাই, ভগবানকে তো আমি চিরকালই মানি, কিন্তু ঠিক এমন বলে মানি নি। কিন্তু লতিকা আমাকে মানিয়েছে।"

"সেজন্য তাকেও ধন্যবাদ। ভাল কথা, বিয়েটা হ'চ্ছে কোথায় ? মানে, কার সঙ্গে ?"

"ওঃ—সে কথা বলাই হয় নি—লতিকা—তোমার লতিকাকে বিয়ে ক'রছি আমি—সেই বেশ্যাটা !" বলিয়া অসীম হাসিল।

হরিচরণের মুখের উপর কে যেন কালি ঢালিয়া দিল। সে কোনও কথা বলিতে পারিল না।

অসীম ভাবিল—হরিচরণ লতিকাকে ঘৃণা করে বলিয়া নীরব হইয়া গেল। তাই সে হাসিয়া বলিল, "কিন্তু তুমি যা ভেবেছিলে তার সম্বন্ধে সে বিলকুল ভুল। আমি তার কাছে শুনেছি সব কথা।" বলিয়া অসীম সংক্ষেপে সেদিনকার প্রকৃত অবস্থা প্রকাশ করিয়া বলিল।

হরিচরণ অনেক কষ্টে বলিল, "তা বেশ, খুব খুসী হ'লাম। এখন তবে আসি, বিয়ের সময় দেখা হবে। আর শোন, লতিকার সঙ্গে আর আমি এখন দেখা ক'রবো না। কিন্তু আমার হ'য়ে তুমি তার কাছে মাপ চেয়ো। বলো যে, আমি যে ভুল ক'রে তার উপর অবিচার করেছি, সে কথা তার পরদিনই বুঝতে পেরেছিলাম—কিন্তু ক্ষমা চাইতে সাহস হয় নি। আজ অনুতপ্ত হৃদয়ে ক্ষমা চাচ্ছি।" তার শেষ কথাগুলি অশ্রুর আবেগে ভার হইয়া গেল। তারপর হরিচরণ একটা উদ্ধত দীর্ঘশ্বাস কষ্টে চাপিয়া একটু হাসিমুখে টানিয়া আনিয়া বলিল, "কিন্তু অসীমদা তোমার এ ভগবানও তো মনগড়া! লতিকার মনগড়া। নয় কি?" তা হয় হোক এতেই আমার মন ভরেছে। অতঃপর সে তাড়াতাড়ি বিদায় লইয়া চলিয়া গেল।

*　　*　　*　　*　　*

আবার সব শেষ হইয়া গেল। হরিচরণের কাছে জীবনের আর কোনও স্বাদ রহিল না।

সে উধাও হইয়া ছটপট্ করিয়া অনেকক্ষণ চারিদিকে ঘুরিয়া শেষে ঘরে ফিরিয়া আসিল।

কিসের জীবন? কিসের চেষ্টা? আর কিছুই সে করিবে না। একেবারে পরিপূর্ণরূপে হতচ্ছাড়া হইয়া যাইবে।

সে ইটালীয়ান ভদ্রলোককে চিঠি লিখিয়া জানাইল; চাকুরী সে করিবে না, ছবি বেচিতে পারিবে না।

ছবিখানা আনিয়া সে তুলিয়া রাখিল। বিবাহের দিন ইহাই সে দম্পতীকে উপহার দিবে স্থির করিল।

তার সমস্ত মনটা যেন জড়, অচেতন হইয়া গেল—কোনও রকম সাড়াই সে দেয় না। কেবল থাকিয়া থাকিয়া তার মনে হয়—কি প্রচণ্ড পরিহাস এই জীবন,—কি নিরর্থক একটা অভিনয়! অবিশ্বাসী অসীম আজ ইহার তলায় ভগবানকে দেখিতেছে—কি অদ্ভুত ভ্রান্তি! ভগবান। সে তো একটা ছেলেভোলান কথা! ভগবান নাই—যদি কিছু থাকে তবে সে বিকট এক রাক্ষস!

* * * * *

বিবাহের পূর্ব্বদিন উপহার লইয়া হরিচরণ লতিকার বাড়ীতে উপস্থিত হইল—এতদিন সে অসীম বা লতিকাকে দেখা দেয় নাই। আজ চিত্তে এক অস্বাভাবিক প্রশান্ততা লইয়া সে লতিকার কাছে গেল, উপহার দিতে।

লতিকা তার দিকে চাহিয়া হঠাৎ মুখ ফিরাইয়া ঘরে প্রবেশ করিল। তার এই ব্যবহার হরিচরণের মনে বড় আঘাত করিল।

সে নীরবে একা দাঁড়াইয়া রহিল।

কিছুক্ষণ পরে লতিকা বাহির হইয়া আসিল। শান্তভাবে সে বলিল, "আপনি দাঁড়িয়ে র'য়েছেন। আসুন, বসুন।"

যন্ত্রের মত সে ঘরে ঢুকিয়া ছবিখানা রাখিয়া বসিল। বলিল, "এই আমার wedding present।"

গম্ভীরভাবে লতিকা সেদিকে চাহিয়া দেখিল। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস গোপন করিয়া সে বলিল, "উনি বলছিলেন, এ ছবিখানা আপনি হাজার টাকায় বেচেছেন।"

"না বেচি নি—বেচতে পারি নি।"

"আমিও ঠিক তাই ভেবেছিলাম। হাজার টাকা দিয়ে এ প্যাঁচামুখ কে কিনবে বলুন?"

একটা অন্তঃসারশূন্য হাসি হাসিয়া হরিচরণ বলিল, "কেনবার লোক কিন্তু ছিল। আমিই বেচতে পারলাম না।"

ইহার পর কিছুক্ষণ দুজনে নীরবে নতমস্তকে বসিয়া রহিল।

একটা কোনও কথা না বলিলে ভাল দেখায় না বলিয়া অনেক মাথা খুঁড়িয়া হরিচরণ একটা কথা বাহির করিল। সে বলিল, "আপনাদের কোর্টশিপটা বড় সংক্ষিপ্ত হ'য়েছে। ব'লতে গেলে দুদিনও নয়।"

মাথা নীচু করিয়া লতিকা সংক্ষেপে বলিল, "হুঁা।"

আবার চুপ।

শেষে হরিচরণ বলিল, "যেখানে দুজনে দুজনকে অনেক দিন থেকে গোপনে ভালবাসে, সেখানে এমনিই হয়।"

লতিকা এ কথার উত্তর দিতে পারিল না। সে মুখ নীচু করিয়াই বসিয়া রহিল। তারপর সে মাথা ঝাড়িয়া তুলিয়া বলিল, "তুমি এ কথা ব'লছো? —তুমি কি অন্ধ?"

হরিচরণ চমকাইয়া উঠিল। তার যত্নরচিত প্রশান্ততা উড়িয়া গেল। লতিকার সজল চক্ষুর দিকে চাহিয়া সরল সত্যটা তার কাছে চট্ করিয়া প্রকাশ হইয়া গেল! সে বুঝিল যে, লতিকা অসীমকে ভালবাসে নাই, তাকেই ভালবাসিয়াছে। তার এখন মনে হইল যে, লতিকার অসীমকে বিবাহ করা শুধু হরিচরণের স্পর্দ্ধার শাস্তি! একটা প্রচণ্ড আকুলতা তার সমস্ত অন্তর-বাহির তোলপাড় করিয়া দিল। সে একটা আবেগপূর্ণ উত্তর দিতে গিয়াই দেখিল অসীম আসিতেছে।

সে তাড়াতাড়ি বলিল, "এই যে অসীমদা, এসো—অনেকক্ষণ তোমার জন্যে ব'সে আছি।"

লতিকা উঠিয়া গেল।

* * * * *

ইহার পর হরিচরণের মনের ভিতর হু হু করিয়া দাবানল জ্বলিতে লাগিল। হতভাগ্য মূর্খ সে—নিজের বুদ্ধির দোষে সে করায়ত্ত স্বর্গ হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। জীবনের সর্ব্বস্ব সে খোয়াইয়া বসিয়াছে। হাতের কাছে তার যে রাজার সম্পদ ছিল, তাহা সে দুহাতে ঠেলিয়া ফেলিয়াছে,—সৌভাগ্য যখন তার দুয়ারে ঠেলাঠেলি করিতেছিল, তখনই সে তাহা পদাঘাতে দূর করিয়াছে!

আজ সে ধনীর চেয়ে ধনী, সুখীর চেয়ে সুখী হইতে পারিত। শুধু বুঝিবার ভুলে আজ সে সর্ব্বহারা!

* * * * *

বিবাহের দিন যে কয়টি বন্ধু আসিয়াছিল, তারা খুব সোরগোল করিয়া আনন্দ উৎসব করিল—হাস্য-পরিহাসের অবিচ্ছিন্ন বন্যা বহাইয়া দিল তারা।

সবচেয়ে বেশী চেঁচামেচি করিল হরিচরণ। সে যে এত হাসিতে পারে, তা কেউ কোনও দিন ভাবে নাই। কথায় কথায় হাসিয়া সে গড়াগড়ি দিল, নাচিয়া কুঁদিয়া সে একটা হৈ চৈ লাগাইয়া দিল।

লতিকা দেখিয়া অনেকগুলি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল।

বিবাহের পর ভোজের সময় পরিবেষণের ভার লইয়াছিল হরিচরণ। ছুটাছুটি করিয়া সে পরিবেষণ করিতে লাগিল, ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি করিয়া সে বাড়ী মাতাইয়া তুলিল। দই, সন্দেশ পরিবেশন করিতে গিয়া সে তিন চার জনের মাথায় দই ঢালিয়া হাসিয়া গড়াগড়ি দিল।

তার হাসি তামাসার মধ্যে একমুহূর্ত্তের ছেদ ছিল না, কাজের ভিতর এক মুহূর্ত্তের অবকাশ ছিল না। সবার সঙ্গে সে ঘুরিয়া ফিরিয়া কথা কহিল, হাসাহাসি করিল, অসীমকে কাঁধে করিয়া কিছুক্ষণ নাচিল,—শুধু লতিকার সঙ্গে সে কথা কহিল না, তার দিকে সে একবারও চাহিল না। একটা নির্জ্জন ঘর দেখিয়া সেখানে ঢুকিয়া পড়িল। হাতের বাসন ফেলিয়া দিয়া সে একটা লম্বা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া দাঁড়াইল।

তার পিছু পিছু লতিকা সে ঘরে আসিল।

সমস্তক্ষণ সে আজ হরিচরণকে দেখিয়াছে, তার সব আশ্চর্য্য কার্য্যকলাপ দেখিয়া তার বুক ঠেলিয়া কান্না পাইয়াছে ; হরিচরণকে এ ঘরে আসিতে দেখিয়া সেও পলাইয়া আসিয়াছে।

লতিকা হরিচরণের হাত ধরিল। হরিচরণ চমকাইয়া তার মুখের দিকে চাহিল—তারপর নতনয়নে নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল।

লতিকার দুই চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল। কোনও কথা সে বলিতে পারিল না। অনেকক্ষণ সজল নয়নে নীরবে সে হরিচরণের মুখের দিকে দিকে চাহিয়া রহিল—হাতে হাত ধরিয়া অশেষ ব্যথাভরা দৃষ্টিতে সে চাহিয়া রহিল।

অনেকক্ষণ এমনি থাকিয়া সে বলিল, "বড় দুঃখ দিলে শেষে।" আবার সে নীরব হইল।

অঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া সে আবার বলিল, "মেকী হাসি দিয়ে কান্না ঢাকবার এ আয়োজন মিছে।—ওঃ! এত দুঃখ আমি দিলাম তোমাকে!"

আবার কিছুক্ষণ পর সে বলিল, "আমাকে ক্ষমা ক'রো!"।

হরিচরণ আর পারিল না। তাড়াতাড়ি হাত টানিয়া লইয়া সে চক্ষু ঢাকিয়া ছুটিয়া পলাইল।

উৎসবের শেষে যখন লতিকা অসীমের হাত ধরিয়া তার সঙ্গে গাড়ীতে উঠিতে গেল, তখন লতিকার ব্যাকুল চক্ষু ছুটি সেই ব্যথাতুর সর্ব্বহারাকে বৃথাই খুঁজিয়া ফিরিল।

সমাপ্ত